Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture's
Volume-2, Issue-iv, published on October 2022, Page No. 188–202
Website: https://www.tirj.org.in, Mail ID: trisangamirj@gmail.com
e ISSN : 2583 – 0848 (Online)

শওকত ওসমান, সৈয়দ ওয়ালীউল্লাহ্‌, আবু ইসহাক : পূর্ব বাংলার উপন্যাসে সমাজ-সংস্কৃতি (১৯৪৭ - ১৯৭০)

মো. হাবিবুল্লাহ্‌
স্নাতকোত্তর, বঙ্গভাষা ও সাহিত্য বিভাগ
রবীন্দ্রভারতী বিশ্ববিদ্যালয়
ইমেল : habibullah.contact@gmail.com

Keyword
দেশভাগ, পূর্ববঙ্গ, মুসলমান, উপন্যাস, সমাজ-সংস্কৃতি, লালসালু, সূর্য-দীঘল বাড়ী, চৌরসন্ধি।

Abstract
উনিশ শতকে কলকাতা কেন্দ্রিক হিন্দু মধ্যবিত্তদের মধ্যে যে রেনেসাঁ বা নবজাগরণের উন্মেষ ঘটেছিল, বিভিন্ন কারণে মুসলমানদের মধ্যে তা দেখা যায়নি। উনিশ শতকের দ্বিতীয়ার্ধে এই নবজাগ্রত হিন্দু মধ্যবিত্ত শ্রেণির হাতেই বাংলা উপন্যাসের শুভ-সূচনা। দেশ বিভাগপূর্ব বাংলার শিক্ষা-সাহিত্য-সংস্কৃতির প্রধান ও একমাত্র কেন্দ্রস্থল ছিল কলকাতা। বিভিন্ন পত্র-পত্রিকা, সাময়িকী, লেখকদের রচনাবলী প্রভৃতি কলকাতা থেকেই প্রকাশিত হত। মূলত ১৯০৫ এর বঙ্গভঙ্গের সময়ে ঢাকার গুরুত্ব বৃদ্ধি পায় ও ১৯৪৭ এর পর ঢাকা পূর্ববঙ্গের রাজধানীতে পরিণত হয়। ফলে বিভাগোত্তর সময়ে পূর্ব পাকিস্তানের ঢাকার নগরায়ণের সঙ্গে সঙ্গে ওপার বাংলার লেখকদের সাহিত্য-সংস্কৃতি চর্চার বিকল্প কেন্দ্রভূমি গড়ে উঠতে থাকে। যা বর্তমানে বাংলাদেশের সাহিত্য নামে পরিচিত। বাংলাদেশের সাহিত্যের ধারাটি বৃহত্তর বাংলা সাহিত্যের ঐতিহ্যের অনুসারী হলেও, পূর্ববাংলার উপন্যাস সমূহের একটি স্বতন্ত্র পটভূমি আছে। এই ঐতিহাসিক পটভূমি ও সাথে সাথে সমাজ-বাস্তবতা, গ্রামীণ-নাগরিক জীবন, আরবি-ফারসি শব্দের ব্যবহার ও ভাষার আঞ্চলিকতা, মুসলমান মানস, ভাষা আন্দোলন ও মুক্তিযুদ্ধ প্রভৃতি পূর্ববঙ্গ তথা বাংলাদেশের সাহিত্যকে দিয়েছে এক স্বতন্ত্র পরিধি ও পরিচিতি। যেমন, পূর্ববঙ্গের উপন্যাসে গ্রাম-কেন্দ্রিকতা বিশেষভাবে লক্ষ্য করা যায়। এপার বঙ্গে যে সময় 'শহরতলী', 'চেনামহল', 'কিনু গোয়ালার গলি' বা 'বারো ঘর এক উঠোন' প্রভৃতি রচিত হচ্ছিল, তখনও ওপার বঙ্গে সেই অর্থে নগরাশ্রিত উপন্যাসের দেখা মেলেনি। কারণটা সেই ভৌগোলিক, অর্থনৈতিক, সামাজিক ও রাজনৈতিক। বিশ শতকের প্রথম দিকে পূর্ববঙ্গে কিছু সংখ্যক সাহিত্য রচিত হলেও, মূলত পূর্ববঙ্গের সাহিত্যের বীজ প্রোথিত হয় তিনের দশকে। ১৯২১ সালে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠিত হওয়ার পর উক্ত বিশ্ববিদ্যালয় এবং ঢাকা ইন্টারমিডিয়েট কলেজের কয়েকজন তরুণ শিক্ষক ও ছাত্রদের মিলিত উদ্যোগে প্রতিষ্ঠা লাভ করে 'মুসলিম সাহিত্য সমাজ' (১৯২৬) এবং তার বার্ষিক মুখপত্র 'শিখা' (১৯২৭)। প্রাক্-স্বাধীনতা পর্বে পূর্ববঙ্গে উপন্যাসের ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপিত হলেও, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়কে কেন্দ্র করে যে মধ্যবিত্ত-মুসলমান সম্প্রদায় গড়ে উঠেছিল, সেই সম্প্রদায়ের কয়েকজনের ঐকান্তিক প্রচেষ্টার মধ্য দিয়েই পূর্ববঙ্গের উপন্যাসের প্রকৃত পথচলা। আর বিভাগ পরবর্তীকালে পূর্ববঙ্গের

সাহিত্যের এই বিপুল ধারাটিকে যারা বিশেষভাবে পরিপুষ্টতা দান করেছিলেন তাঁদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য তিনজন হলেন শওকত ওসমান, সৈয়দ ওয়ালীউল্লাহ ও আবু ইসহাক। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর রাজশেখর বসু-কে উৎসর্গ করে লিখেছিলেন— 'সহজ কথায় লিখতে আমায় কহ যে/সহজ কথা যায় না লেখা সহজে।' আসলেই কথাটা খাঁটি। যেমন আমাদের অতি পরিচিত শব্দ 'সমাজ', 'সংস্কৃতি', 'সভ্যতা' প্রভৃতি বিষয়ে লেখা শুরু করা খুব সহজ, কিন্তু শেষ করা ততটাই কঠিন। কারণ এই পরিভাষা গুলি খুবই জটিল, কুটিল; বহু বিতর্কিত ও সদা বিবর্তিত। তাই ভারতীয় সংস্কৃতির ত্রিবেণী-স্রোতস্বিনীর মতো এই আলোচনাও ভবিষ্যতে চলতেই থাকবে, কারণ এ আলোচনার- 'শেষ নাহি যে'।

Discussion

এক

পূর্ববঙ্গের নির্বাচিত উপন্যাসে সমাজ-সংস্কৃতি (১৯৪৭-১৯৭০) শীর্ষক আলোচনার পূর্বে পূর্ববঙ্গের সামাজিক, আর্থিক ও বিশেষভাবে রাজনৈতিক ইতিহাস উল্লেখের দাবি রাখে। পূর্ববঙ্গ মূলত একটি নদীমাতৃক ও কৃষিপ্রধান দেশ; পশ্চিমবঙ্গও অনেকটা তাই। তবুও সমাজ, সাহিত্য, সংস্কৃতি, রাজনীতি, অর্থনীতি সহ নানা দিক দিয়ে পূর্ববঙ্গের সঙ্গে পশ্চিমবঙ্গের বৈসাদৃশ্য পরিলক্ষিত হয়। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর লিখেছিলেন –

> "পূর্ববঙ্গ পশ্চিমবঙ্গ, রাঢ় বারেন্দ্রের ভাগ কেবল ভূগোলের ভাগ নয়; অন্তরের ভাগও ছিল তার সঙ্গে জড়িয়ে, সমাজের মিল ছিল না।"[১]

এই মনের ভাগ, মননের ভাগ তো ছিলই, সাথে যোগ হয়েছিল দেশভাগ। ফলে বাঙালি সংস্কৃতি কোনও অখণ্ড সংস্কৃতি হয়ে ওঠেনি, বরং বাংলার সমাজ-সংস্কৃতি বহুধা বিভক্ত ও বহুরঙে রঞ্জিত। এই বিভক্তি যেমন— রাজনৈতিক সীমানা দিয়ে চিহ্নিত করলে পশ্চিমবঙ্গ-পূর্ববঙ্গ (পরে পশ্চিম পাকিস্তান); ধর্মের দিক দিয়ে বিভাজন করলে হিন্দু-মুসলমান; বর্ণের ভিত্তিতে দেখলে আশরাফ-আতরাফ, উচ্চবর্ণ-নিম্নবর্ণ; এবং বাসস্থানের দৃষ্টিতে দেখলে-গ্রাম ও নগর সংস্কৃতি।

১৯৪৭-এ র‍্যাডক্লিফ লাইন ধরে যে বঙ্গবিচ্ছেদ ঘটেছিল তার পূর্বে, এবং পরবর্তীতে সংঘটিত হয়েছিল যে অসংখ্য ঘটনা, তা অনুল্লেখ থেকে গেলে এই আলোচনা কোথাও যেন অসম্পূর্ণ থেকে যাবে। কারণ সে সময়ের রাজনৈতিক পরিবেশ-পরিস্থিতি নির্বাচিত উপন্যাসের সমাজ-সংস্কৃতির মর্মার্থ অনুধাবনে বিশেষ সহায়ক। ১৯০৫ সালে প্রশাসনিক কাজের অজুহাতে বাংলাকে বিভক্ত করা হলে বাঙালিদের মধ্যে মিশ্র অভিব্যক্তি দেখা গিয়েছিল। একদিকে বঙ্গভঙ্গের সমর্থন, অন্যদিকে এর বিপক্ষে উগ্র স্বদেশি আন্দোলন সংগঠিত হয়েছিল। যার ফলস্বরূপ হিন্দু-মুসলমান দুই সম্প্রদায়ের মধ্যে সংঘর্ষ পর্যন্ত বেধে যায়। পূর্ববঙ্গের কিছু অর্থবান মুসলমান নিজেদের স্বার্থে এই বিভাগকে সমর্থন করেছিল আর হিন্দুরা জমি হারানোর আশঙ্কায় এর বিরোধিতা করেছিল, শুধু এতটুকু বললে ইতিহাসের পুরোটা বলা হয় না। কারণ এক বিপুল সংখ্যক হিন্দু-মুসলমান এই লাভ-ক্ষতির হিসেবের বাইরে বেরিয়ে বঙ্গভঙ্গ রদ করার জন্য পথে নেমেছিলো। তবে একথা অনস্বীকার্য, বঙ্গব্যবচ্ছেদের ফলে একশ্রেণির মুসলমান শিক্ষা, অর্থে ও রাজনৈতিক সচেতনতায় কিছুটা অগ্রসর হয়েছিল। ঢাকার নবাব সলিমুল্লাহ্'র উদ্যোগে গড়ে ওঠা মুসলিম লিগ (১৯০৬) যার নিদর্শন। ১৯১১ সালে বঙ্গভঙ্গ রদ হলেও হিন্দু-মুসলমান উভয়ের মধ্যেকার অদৃশ্য বিভাজন ইতোমধ্যে আরও গভীর ভাবে রেখাপাত করে যায়। যা আরও মজবুত ও স্থায়ী হয় লাহোর প্রস্তাব (১৯৪০) -এর পর। তেতাল্লিশে (১৯৪৩) ডাস্টবিনের খাদ্যের জন্যে কুকুরের সঙ্গে লড়াই করে, কিংবা লঙ্গরখানার সামান্য অন্ন খেয়ে যারা বেঁচেছিল; ছেচল্লিশে রক্তাক্ত নদীর স্রোত বেয়ে তারাও মারা যায়। তারপর সাতচল্লিশে লক্ষ লক্ষ্যহীন মানুষ দেশ ছাড়া হয়, জলের মতো সস্তা দামে "নিলেমের ঘরবাড়ি আসবাব - অথবা যা নিলেমের নয়/সে-সব জিনিস"[২] ছেড়ে পাড়ি দেয় নতুন ঠিকানার সন্ধানে। মন্বন্তর, দাঙ্গা, দুঃখ কিংবা দেশভাগ, সব মিলিয়ে সেই সময় "বাংলার লক্ষ গ্রাম নিরাশায় আলোহীনতায় ডুবে নিস্তব্ধ নিস্তেল"[৩] হয়েছিল। অন্যদিকে নতুন দেশ গঠনে পূর্ববঙ্গের মানুষ আশায়, আশ্বাসে বুক বেঁধেছিল; জিন্নাহ্ এবং আজাদ পাকিস্তানের স্লোগানে ভরিয়ে তুলেছিল বুক ও বাতাস। কিন্তু সেই সব স্লোগানের রেশ কিছুটা স্তিমিত হতেই তারা বুঝতে পারে যে; গরিবের হিন্দুস্থান পাকিস্তান কিছুই নেই, শুধু এক গোরস্থান আছে।বস্তুত, পূর্ববঙ্গের স্বাধীনতার পক্ষপুটেই লুকিয়ে ছিল পুনঃপরাধীনতার বীজ। তাই ডিকলোনাইজেশনের পর পর-ই

রিকলোনাইজেশনে পরিণত হয়ে দিনের আলোর মতো তারা অনুভব ও অবলোকন করতে পারে 'সব ঝুট হ্যায়'। এক ধর্ম ছাড়া পরস্পরের থেকে বারোশো মাইল দূরে অবস্থিত পূর্ব ও পশ্চিম পাকিস্তানের মধ্যে আর কোনও বিষয়ে মিল ছিল না। উপরন্তু, ১৯৪৮ সালে পাকিস্তানের ভাষিক সাম্রাজ্যবাদ বাঙালিকে আরও একটি রক্তক্ষয়ী সংগ্রামের দিকে এগিয়ে দেয়। প্রথমে এই সংগ্রামের মূল "প্রশ্ন ছিল ভাষার। কিন্তু দেখা গেল তার সঙ্গে ভাতের প্রশ্ন জড়িয়ে রয়েছে।"[৪] ফলে বাঙালির ভাষা-আন্দোলন এক ভিন্ন মাত্রা লাভ করে। আমরা জানি, বাঙালির জীবনে ঝড়-ঝঞ্ঝা অনেক এসেছে, কিন্তু বেতস গাছের মতো সে নিজেকে রক্ষা করেছে বারবার। ফলে ভাষা প্রশ্নেও বাঙালি আপস করেনি, পিছু হটেনি; প্রাণ দিয়েছে, ভাষার জন্যে শহিদ হয়েছে। আর নতুন এক ভূখণ্ডকে কল্পনা করেছে, "সে ভূখণ্ডের দক্ষিণে থাকবে একটা সুন্দর বিরাট বন আর তার পাশ দিয়ে বয়ে যাবে সাগর।"[৫] এই নতুন স্বপ্নকে হাতিয়ার করে ছাত্র, যুব, শিক্ষক, সাধারণ মানুষ সকলেই পথে নেমেছিল, ঘোষণা করেছিল—

> "এবারের সংগ্রাম আমাদের মুক্তির সংগ্রাম, এবারের সংগ্রাম আমাদের স্বাধীনতার সংগ্রাম।"[৬]

আর এই সংগ্রামের সরণি বেয়েই ধরণিতে তৈরি হয় একটি নতুন দেশ- 'বাংলাদেশ'।

সাধারণত এটা বলা হয়ে থাকে যে, শিক্ষা জাতির মেরুদণ্ড ও অর্থ জাতির শোনিত। কিন্তু এই উভয় দিক দিয়েই হিন্দুদের তুলনায় মুসলমানরা যে শতবর্ষেরও বেশি পিছিয়ে ছিল, দুটি দিক দিয়ে এর উদাহরণ দেওয়া যেতে পারে। প্রথমত, ১৮১৭ সালে হিন্দু কলেজ প্রতিষ্ঠার মধ্য দিয়ে হিন্দু বিশিষ্টজনেরা সমাজকে যা দিতে পেরেছিলেন, মুসলমান বিশিষ্টজনেরা তা পেরেছিলেন ১৯২৬ সালে ইসলামিয়া কলেজ প্রতিষ্ঠার দ্বারা। দ্বিতীয়ত, ১৭৯৩ এ চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত প্রবর্তন হওয়ার পর থেকে কলকাতা কেন্দ্রিক হিন্দু মধ্যবিত্তের উদ্ভব হয়। আর মুসলমানদের মধ্য থেকে মধ্যবিত্তরা উঠে আসে বঙ্গভঙ্গের পর, মূলত ঢাকাকে কেন্দ্র করে। কলকাতার থেকে ঢাকার ইতিহাস অনেক পুরনো, যদিও ঢাকায় নগরায়ণ শুরু হয়েছে কলকাতার অনেক পরে। বঙ্গভঙ্গোত্তর কালে নতুন প্রদেশের রাজধানী হিসেবে ঢাকার মর্যাদা দ্রুত বৃদ্ধি পায়। ঢাকার চারপাশে স্কুল, কলেজ, বিশ্ববিদ্যালয়, আদালত গড়ে ওঠে। আর এই সময়ে পূর্ববঙ্গে মধ্যবিত্ত শ্রেণি মূলত পাটের উপর নির্ভর করে বিকাশ লাভ করে। বিশ শতকে বিশ্বযুদ্ধসহ নানা কারণে বিশ্ববাজারে পাটের চাহিদা বৃদ্ধি পেলে কলকাতায় পাটকলের প্রসার ঘটে। ঘটনাচক্রে তৎকালে বাংলার পাটের ৯২ শতাংশ পূর্ববঙ্গেই উৎপন্ন হত। আর এই পাট যারা উৎপন্ন করত এবং যেসব মধ্যসত্ত্বভোগী তা কলকাতার পাটকলে যোগান দিত তাদের একটা বড়ো অংশই ছিল মুসলমান। আর এই সময়ে মুসলমান মধ্যবিত্ত সম্প্রদায়ের মধ্যে শিক্ষার প্রসারও ঘটেছিল অনেক দ্রুত। ১৯০৭ থেকে ১৯১২ সালে সমগ্র বাংলায় যেখানে শিক্ষিত জনসংখ্যা বৃদ্ধির হার ছিল ৩৭ শতাংশ; সেখানে পূর্ববঙ্গে সেই হার বেড়েছিল ৮৩ শতাংশ। কর্মক্ষেত্রে মূলত সরকারি চাকরি ও ছোটো ব্যবসার আশায় মুসলমানরা শিক্ষার্জন করলেও কার্যক্ষেত্রে তারা দেখল; চাকরি, ব্যবসা-বাণিজ্য —সর্বত্রই হিন্দুদের একচ্ছত্র অধিকার। পূর্ব বাংলার ৯০ শতাংশ জমিদার ও ৯৯ শতাংশ মহাজন ছিলেন বর্ণ-হিন্দু। অন্যদিকে মুসলমানরা ছিল নিম্নবিত্তের কৃষক, বড়ো জোর দু-একজন কলোনির কেরানিজীবি। 'মুসলিম সাহিত্য সমাজ' -এর চতুর্থ বর্ষে সভাপতির অভিভাষণে নাসিরউদ্দীন আহমদ তাই আক্ষেপের সুরে বলেছিলেন—

> "তুলনামূলক সমালোচনা করলে তাই দেখা যায় হিন্দু আজ জমিদার, মুসলমান তার প্রজা, হিন্দু আজ চিকিৎসক, মুসলমান চিকিৎসিত রোগী, হিন্দু প্রফেসার, মুসলমান ছাত্র, হিন্দু উকিল, মুসলমান মক্কেল, হিন্দু সওদাগর মুসলমান তার খরিদ্দার, হিন্দু উত্তমর্ণ বা মহাজন, মুসলমান অধমর্ণ বা দায়িক— এক কথায় জাতীয় জীবনে সমস্ত দিকে হিন্দুর প্রভাব অনুভূত হয়।"[৭]

ফলে "হিন্দুরা আমাগ দ্যাখলে ছ্যাপ ফালায়, আমরা-অ ছ্যাপ ফ্যালামু"[৮] —এই প্রতিক্রিয়াশীলতা কিংবা চাকরি, জমি, জমিদারি; "শিক্ষা দীক্ষা সব হিন্দুদের"[৯] —এই না পাওয়ার ক্ষোভ মুসলমানদেরকে উত্তেজিত করেছিল। শুরু হয়েছিল শ্রেণি স্বার্থকে ধর্মের মোড়কে উপস্থাপন করে নিম্নবিত্ত মুসলমানদের সমর্থন নিয়ে পাকিস্তান আন্দোলন।

পূর্ববঙ্গের উপন্যাস নিয়ে আলোচনা করতে গেলে ভাষার কথা বলতেই হয়। কারণ সমাজ-সংস্কৃতির একটি গুরুত্বপূর্ণ উপাদান হল ভাষা। পূর্ববঙ্গের মুসলমানদের মধ্যে এই ভাষা দ্বন্দ্ব দেখা গেছে বারবার। বাংলার মুসলমানদের ভাষা উর্দু হবে নাকি বাংলা এ নিয়ে কিছু শিক্ষিত মুসলমানদের মধ্যে যেমন দ্বন্দ্ব ছিল তেমনি, ৪৭ পরবর্তী সময়ে বাঙালি মুসলমানদের উপর উর্দুকে চাপানো, রোমান হরফে বাংলা লেখার পরামর্শদান বা আরবি হরফে উর্দু-বাংলার মিশ্রণে নতুন

জাতীয় ভাষার প্রস্তাব সেই সময়ের ভাষা দ্বন্দ্বকেই স্পষ্ট করে। তবে উনিশ-বিশ শতকে শুধু যে মুসলমানদের মধ্যেই ভাষাদ্বন্দ্ব ছিল, তা হয়ত নয়। যেমন 'একেই কি বলে সভ্যতা?' প্রহসনে নব'র উক্তি—

> "ও আমাকে লাইয়র বললে- আবার ট্রাইফ্লীং? ও আমাকে বাঙ্গালা করে বলে না কেন? ও আমাকে মিথ্যাবাদী বললে না কেন? তাতে কোন্ শালা রাগতো? কিন্তু - লাইয়র - এ কি বরদাস্ত হয়।"[১০]

ফলে ব্রিটিশ শাসনামলেই হিন্দু-মুসলমান নির্বিশেষে শিক্ষিতদের (সকলের নয়) মধ্যে যে বাংলা ভাষার প্রতি এক প্রকারের তাচ্ছিল্যের ভাব ছিল, তা অস্বীকার করার উপায় নেই।

এই আলোচনায় ৭১ পূর্ববর্তী সময়ে বাংলাদেশের প্রধান তিনজন ঔপন্যাসিকের উপন্যাস নির্বাচন পদ্ধতি বিষয়ে কিছু কথা বলা প্রয়োজন বোধ হচ্ছে। এই আলোচনার অধীনে সৈয়দ ওয়ালীউল্লাহ্'র 'লালসালু' (১৯৪৮) উপন্যাসটি বাছাই করা হয়েছে। কারণ, 'লালসালু'-র মধ্যে যে সমাজ-বাস্তবতা আছে তা লেখকের বাকি উপন্যাস দুটিতে ('চাঁদের অমাবস্যা', 'কাঁদো নদী কাঁদো') ততটা নেই। ১৯৭০-এর মধ্যে আবু ইসহাক একটিই মাত্র উপন্যাস রচনা করেছিলেন 'সূর্য-দীঘল বাড়ী'(১৯৫৫); ফলে এটিকেই নির্বাচন করতে হয়েছে। আর শওকত ওসমানের 'চৌরসন্ধি' (১৯৬৬) উপন্যাস নির্বাচনের মূলে কাজ করেছে প্রধানত দুটি কারণ: (এক) শওকত ওসমানের 'বনী আদম' ও 'জননী' —উপন্যাস দুটি বিভাগপূর্ব পশ্চিমবঙ্গের পটভূমিতে রচিত। 'ক্রীতদাসের হাসি' বাগদাদের ভূমিতে রূপকের আড়ালে নির্মিত। তাছাড়া এই লেখাটি 'উপন্যাস না নাটক' তা নিয়ে তর্ক হতে পারে বলে উল্লেখ করেছেন লেখক-কন্যা বুলবন ওসমান। লেখকের 'সমাগম' উপন্যাস কল্পজগতের আড়ালে বিশ্বমানবতার কাহিনি। আর 'রাজা উপাখ্যান' রূপকাশ্রয়ী, কাহিনিভাগ ফেরদৌসির 'শাহনামা' থেকে গৃহিত। ফলে ১৯৭০-এর সময়পর্বে চোরদের নিয়ে রচিত 'চৌরসন্ধি' উপন্যাসটি নির্বাচন করা হয়েছে। (দুই) আলোচনার জন্য নির্বাচিত প্রথম উপন্যাস দুটি ('লালসালু', 'সূর্য-দীঘল বাড়ী') গ্রামজীবন কেন্দ্রিক। ফলে তুলনামূলক আলোচনার সুবিধার্থে একটি শহরকেন্দ্রিক উপন্যাসের প্রয়োজনীয়তা ছিল। ঢাকা শহরকে কেন্দ্র করে লেখা 'চৌরসন্ধি' হয়ত সেই প্রয়োজনকেই কিছুটা পূরণ করেছে।

দুই

সংজ্ঞাকারে সমাজ-সংস্কৃতি 'কিমিদম্' তথা কী বস্তু —তা বোঝা কঠিন এবং বোঝানো কঠিনতর। কারণ এ বিষয়ে বিস্তর বিচার-বিতর্ক বিদ্যমান। সংস্কৃত 'সমাজ' শব্দটিকে ভাঙলে পাওয়া যাবে : সম্+√অজ্+অ। হরিচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'বঙ্গীয় শব্দকোষ'-এ সমাজের অর্থ করা হয়েছে- 'উদ্দেশ্যবিশেষার্থ মিলিত জনসমূহ'। সমাজবিজ্ঞানী জিসবার্টের ভাষায়, সমাজ হল সম্পর্কের এক জটিল জাল বিশেষ, যার দ্বারা প্রতিটা মানুষ নিজেদের মধ্যে আন্তঃসংযোগ স্থাপন করে—

> "Society, in general, consists in the complicated network of social relationships, by which every human being is interconnected with his fellowmen."[১১]

আবার এই মনুষ্য-সমাজ নিত্য-নিয়মিত পরিবর্তন ও বিবর্তনশীল। যেমন আমেরিকার নৃতত্ত্ববিদ লুইস হেনরি মর্গান সমাজ-বিবর্তনকে তিনটি স্তরে বিভক্ত করেছেন; বন্যযুগ, বর্বর যুগ ও সভ্যযুগ (civilization)। বলাবাহুল্য যে, এই তিন যুগের মধ্যে আমরা সভ্যযুগে বসবাস করছি এবং এই যুগের উপরেই আমাদের যাবতীয় আলোচনা।

আর 'সংস্কৃতি' শব্দটিকে ভাঙলে পাওয়া যাবে : সম্+√কৃ+তি। স্বদেশে এবং বিদেশে সংস্কৃতির স্বরূপ নির্ণয়ে সুপ্রচুর মতামত থাকলেও, কোনও একটি মত অদ্যাবধি সর্বজনগ্রাহ্য হিসেবে পরিগণিত হয়নি। আমরা জানি যে, 'কালচার' শব্দটি পৃথিবীর অন্যতম জটিল শব্দ হিসেবে বিবেচিত—

> "one of the two or three most complicated words in the English language."[১২]

কালচার শব্দটি ইংরেজি ভাষায় প্রথম প্রতিষ্ঠাদান করেছিলেন টেলর, ১৮৭১ সালে। কালচার সম্পর্কে টেলর লিখেছিলেন—

> "...is that complex whole which includes knowledge, belief, art, law, morals, custom, and any other capabilities and habits acquired by man as a member of society."[১৩]

তথা সংস্কৃতির পরিধিটা অনেক বিস্তৃত। মানুষের দৈনন্দিন অভ্যাস, রীতি-নীতি, আচার-বিশ্বাস, নিয়ম-কানুন, ভাষা, শিক্ষা -এ সবই সংস্কৃতির অন্তর্ভুক্ত। নৃবিজ্ঞানের সংক্ষিপ্ত সংজ্ঞায় সংস্কৃতি হল,

"Earned behaviour বা অর্জিত আচার আচরণ।"[১৪]

আবার কারও মতে,

"ব্যষ্টি বা ইণ্ডিভিজুয়্যালের যা ব্যক্তিত্ব বা পার্সন্যালিটি, সমষ্টি বা কমিউনিটির তা-ই কালচার।"[১৫]

লাতিন 'col' ধাতুর অর্থ - চাষ করা। এই 'col' ধাতু থেকে এসেছে লাতিন শব্দ 'cultura' এবং তা থেকে ইংরেজি 'culture'। ফলে কালচার শব্দের বাংলা প্রতিশব্দ হিসেবে 'কৃষ্টি'র ব্যবহার যথাযুক্তিযুক্ত বলেই মনে হয়। যেমন 'এমন মানবজমিন রইল পতিত আবাদ করলে ফলত সোনা', রামপ্রসাদ সেনের এই গানের লাইনে 'আবাদ' অর্থে উৎকর্ষসাধন বোঝানো হয়েছে। অন্যদিকে বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় কালচার অর্থে 'অনুশীলন' শব্দ প্রয়োগ করেছিলেন। তবে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর কালচারের প্রতিশব্দ হিসেবে 'কৃষ্টি'কে 'কুশ্রী শব্দ' বলে মন্তব্য করে লিখেছিলেন—

"এঁটেল পোকা পশুর গায়ে যেমন কামড়ে ধরে ভাষার গায়ে ওটাও তেমনি কামড়ে ধরেছে।"[১৬]

এক্ষেত্রে রবীন্দ্রনাথ 'সংস্কৃতি' শব্দের পক্ষপাতী ছিলেন। 'সংস্কৃতি' শব্দটি প্রথম পাওয়া যায় 'ঐতরেয় বাহ্মণ' গ্রন্থে—

"...আত্মসংস্কৃতির্বাব শিল্পানি, ছন্দোময়ং বা ঐতৈর্য্যমান আত্মানাং সংস্কুরুতে।"[১৭]

অর্থাৎ —

"এই শিল্পসমূহ হইতেছে আত্মার সংস্কৃতি; এগুলির দ্বারা যজমান (সাধারণ গৃহস্থ) নিজেকে ছন্দোময় করে।"[১৮]

অন্নদাশঙ্কর রায় তাঁর 'ভারতীয় সংস্কৃতির স্বরূপ' প্রবন্ধের মধ্যে বলেছেন যে, ভারতের সংস্কৃতি গঙ্গা-যমুনা-সরস্বতীর ত্রিবেণীসংগমে গড়ে উঠেছে। যেখানে গঙ্গা হল প্রাচীন আর্য বা হিন্দু, যমুনা হল মধ্যযুগীয় মুসলমান বা সারাসেন, আর সরস্বতী হল ব্রিটিশ বা ইউরোপিয় সংস্কৃতি। উক্ত ত্রিবেণী স্রোতের সঙ্গে আবশ্যক ভাবে যুক্ত হবে লোকসংস্কৃতির ধারা। আর এই চারটি স্রোতের সমন্বয়েই গড়ে উঠেছে ভারতীয় সংস্কৃতির চতুরঙ্গ। এই বিশাল ভারতীয় সমাজ-সংস্কৃতির-ই একটি বিশেষ ধারা হল বাঙালি সমাজ-সংস্কৃতি। এখানে মনে রাখতে হবে যে, সংস্কৃতি ও রিলিজিয়ন বা সংস্কৃতি ও সভ্যতার মাঝে কিছু সূক্ষ্ম পার্থক্য বিরাজমান। ল্যাটিন civis (নগর) শব্দ থেকে 'civilisation' (সভ্যতা) এর আবির্ভাব। এই সভ্যতা নগরকেন্দ্রিক। কিন্তু সংস্কৃতি শিক্ষিত-অশিক্ষিত সর্বজন ও নগর-গ্রাম সর্বস্থানে বিরাজমান। যদিও স্থান ও ব্যক্তিভেদে সংস্কৃতির পার্থক্য পরিদৃশ্যমান হয়। বসবাসের জন্য গৃহনির্মাণ সভ্যতার একটি উপকরণ ও স্মারক। গুহাগৃহ, মৃত্তিকাগৃহ, অট্টালিকা —এগুলো সভ্যতার বিভিন্ন অবস্থাকে চিহ্নিত করে। আর সংস্কৃতি হল গৃহনির্মাণের সঙ্গে বিজড়িত বিভিন্ন চিন্তাভাবনা। যেমন— গৃহের দিকনির্ণয়, গৃহের কল্যাণ-অকল্যাণ চিন্তা, গৃহের গঠন ও সৌন্দর্য চিন্তা ইত্যাদি। বাঙালির গৃহ, পট ও অন্যান্য চিত্রন; মাটি, পাথর ইত্যাদির ভাস্কর্য; অলঙ্কার শিল্প; বাঙালির খাদ্য, পরিধেয়, কৃষি, ক্রিড়া, ঝুমুর, পাঁচালি, যাত্রা, পুথি পড়া; বাঙালির যানবাহন, সামাজিক-পারিবারিক অনুষ্ঠান, মেয়েদের আলপনা আঁকা, বাঙালির কাঁথা সেলাই প্রভৃতি গৃহশিল্প —এসবই সংস্কৃতির অঙ্গ ও অংশ।

তিন

পাকিস্তান গঠিত হওয়ার অব্যবহিত পরেই শহরবাসী সৈয়দ ওয়ালীউল্লাহ্'র গ্রাম জীবনের প্রেক্ষাপটে রচিত 'লালসালু' উপন্যাস প্রকাশিত হয়েছিল। উপন্যাসের প্রথম শব্দবন্ধ থেকেই ওয়ালীউল্লাহ্ উপোসী বাংলার অরক্ষিত, অবক্ষয়িত সমাজকে বর্ণনা করেছেন, যে সমাজের ক্যানভাসে কিছু পরেই তিনি ফুটিয়ে তুলবেন একটি চরিত্র— মজিদ। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ, যুদ্ধোত্তর ভেঙে পড়া আর্থিক অবকাঠামো, তেতাল্লিশের মহামন্বন্তর, ভয়াবহ সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা; জাতীয় জীবনের এই সংকট-কন্টকাকীর্ণ পথ ধরে 'জুড়ি গাড়ি' চড়ে এসেছিল স্বরাজ-স্বাধীনতা। স্বাধীনতা এলো ঘরে, কিন্তু সেই স্বাধীনতাকে স্বাগত না জানিয়ে গ্রামের গৃহস্থ মানুষের ঘর ছেড়ে "বেরিয়ে পড়বার ব্যাকুলতা"[১৯] আখ্যানের প্রথমেই এক অদ্ভুত সমকালীন সমাপতনের সাক্ষ্য প্রদান করে। উপন্যাসের প্রথমে স্থানিক নামহীন স্থানটি গোটা পূর্ব-বাংলার আর্থ সামাজিক ও ধর্মীয় জীবনাবস্থাকে উপস্থাপন করেছে যেন। "শস্যের চেয়ে টুপি বেশি, ধর্মের আগাছা বেশি।"[২০] ধর্মের ভিত্তিতে দেশভাগের পর পূর্ব-পাকিস্তানে ব্যস্তানুপাতিক ভাবে টুপির সংখ্যা বেড়েছে; কমেছে মাথাপিছু শস্যের পরিমাণ— ইতিহাসের দিকে তাকালে উপন্যাসের এ তথ্য সত্য বলে উপলব্ধ হয়। এছাড়া গোটা পাকিস্তানের মোট জনসংখ্যার ১৫ শতাংশ অঞ্চল নিয়ে পূর্ব পাকিস্তান গঠিত হলেও, ১৯৫১ সালের তথ্যানুসারে তাকে পাকিস্তানের মোট জনসংখ্যার ৫৫ শতাংশের দায়ভার বহন করতে হত। ফলে মানুষের জীবনযাত্রার মানে উন্নতির পরিবর্তে অবনতি, অগ্রগতির বদলে অধোগতি ঘটেছিল।

মুঘল আমল, নবাবী আমল থেকেই মুসলমানের শিক্ষালয় ছিল ধর্মের সঙ্গে অন্বিত মক্তব-মাদ্রাসা। কিন্তু মক্তব-মাদ্রাসার প্রতি নবাবি-নজরানা বন্ধ হলেও তখনও মুসলমান সমাজ ধর্মের ধুয়ো তুলে 'আধুনিক' শিক্ষা থেকে বিমুখ থেকেছিল, আর মগজে কোরআন সঞ্চয় করে জান্নাতে নিজের স্থান পাকা করার প্রতি ছিল স্থিরচিত্ত। সে সময়ের মুসলমানরা হয়ত বোঝেনি বা বুঝতে চায়নি যে,

> "পুরানো সঞ্চয় নিয়ে ফিরে ফিরে শুধু বেচা-কেনা/আর চলিবে না।"[২১]

ফলে মক্তব-মাদ্রাসা পাস এইসব তরুণ প্রজন্মের একটা বড় অংশকে কর্মাভাবে; তথা বেকারত্বের জ্বালা ঘোচাতে দেশত্যাগ করত হত। এই বেকার, দিশাহীন যুবক শ্রেণির প্রতিভূ মজিদ। শ্রাবণের এক 'নিরাক পড়া' দিনে মজিদ ভাগ্যান্বেষণে উপস্থিত হয় মহব্বত নগর গ্রামে। মজিদ গ্রামের একটা টাল খাওয়া, ভেঙে পড়া, প্রাচীন কবরকে মোদাচ্ছের পিরের মাজার বলে প্রচার করে। তারপর লালসালু কাপড়ে-ঢাকা 'মাছের পিঠের মতো' সেই মাজার অনিকেত মজিদের শুধু খাদ্যাভাবকেই নিরসন করেনি, বরং খালেক ব্যাপারীর সহযোগিতায় মজিদ একটি মক্তব প্রতিষ্ঠা করে ও খুব দ্রুত ওই এলাকার কর্তৃত্ব করায়ত্ত করে। 'ধাড়ি ধাড়ি' ছেলেদের লুঙ্গি তুলে লিঙ্গ পরীক্ষা করে, বিভিন্ন অজুহাতে গ্রামের মানুষকে শমন পাঠিয়ে শাসন করে, ধর্মের শবক শেখায়। যেমন- "কলমা জানো মিঞা?",[২২] "কীরে ব্যাটা, খৎনা হইছে?",[২৩] "তোমার দাড়ি কই মিঞা?",[২৪] "হে নামাজ জানে নি?"[২৫] ইত্যাদি। নিরন্ন দিনে যার কাছে শাকান্ন খেয়ে দিনপাত করাটা ছিল বহু ইপ্সিত বিষয়, মহব্বত নগরের মানুষের বদান্যতায় তার ঘর ভরে যায় নবান্নে। মজিদের আগমনের মধ্য দিয়ে মহব্বত নগরের মানুষের ধর্মীয় সত্তা দৃঢ় হয়। তার মুখে আল্লাহ্-দ্রোহী ব্যক্তির আজাব-গজবের কথা শুনে সাধারণ মানুষের মন কচি-কলাপাতার মতো কেঁপে ওঠে। এই ধর্মীয় আস্থাশীলতার সুযোগ নেয় মজিদ ও খালেক ব্যাপারী—

> "একজনের আছে মাজার, আরেক জনের জমি-জোতের প্রতিপত্তি। সজ্ঞানে না জানলেও তারা একাট্টা, পথ তাদের এক।"[২৬]

শুধু শাসনে-শোষনেই নয়, ব্যক্তি জীবনেও মজিদ ও ব্যাপারীর মধ্যে অনেক সাদৃশ্য পরিদৃশ্যমান। ওয়ালীউল্লাহ্ এখানে ধর্মীয় ও সামন্ততন্ত্রীয় শাসন-শোষণকে একাসনে বসিয়ে পূর্ববঙ্গের প্যারাসাইট তথা পরজীবীদের স্বরূপ উন্মোচন করেছেন। শুধু মজিদ একা নয়, বাংলাদেশে ফসল কাটার মৌসুমে অসংখ্য পিরের প্রাদুর্ভাব ঘটত। আর কঠিন কর্মব্যস্ততার মধ্যেও বঙ্গদেশের কৃষকেরা দিনের পর দিন ভিড় ঠেলে লাইনে দাঁড়াত "পির সাহেবের বাতরস-স্ফীত পদযুগলে একবার চুমু দেবার আশায়।"২৭ এছাড়া, নবাগত পির মরা মানুষকেও জিন্দা করতে পারেন, সূর্যের গতিকে ধরে রাখতে পারেন, এমন রটনাকে ঘটনা ভেবে প্রত্যয় ও প্রচারের মধ্য দিয়ে পূর্ব-বঙ্গের মানুষের অশিক্ষা ও কুসংস্কারচ্ছন্ন মন-মানসিকতার পরিচয় পাওয়া যায়।

'বুদ্ধির মুক্তি' আন্দোলনের কর্মী আবুল হুসেন মুসলমান সমাজের দীন, হীন, দরিদ্র, সংকীর্ণ জীবনের প্রতি দৃকপাত করে তার কারণ অন্বেষণ করেছিলেন। এবং এক কথায় এর যে উত্তর তিনি পেয়েছিলেন তা হল— "আমাদের শিক্ষা নাই।"[২৮] ধর্ম বিনষ্ট হওয়ার ভয়ে ইংরেজি শিক্ষাকে দূরে সরিয়ে দেওয়ার প্রবণতা এই উপন্যাসেও ধরা পড়েছে। মোদাব্বের মিঞার ছেলে আক্কাস গ্রামে স্কুল প্রতিষ্ঠায় সচেষ্ট হলে ধর্মীয় প্রশ্ন তুলে তাকে দমিয়ে দেয় মজিদ। মজিদের কাছে স্কুল তৈরির পরিকল্পনা নিছক 'বদ খেয়াল'। এক চিন্তক প্রাজ্ঞোক্তি করেছিলেন- 'morality enforced is immorality in fact', তথা জোরপূর্বক নীতিশিক্ষার ফল যে হিতে বিপরীত হবে, সে তো জানা কথাই। এই উপন্যাসে ধর্মীয়-শিক্ষিত মজিদ সেই অধার্মিক কাজের-ই নজির রেখেছে। দ্বিতীয় পক্ষ হিসাবে জমিলাকে বিয়ে করার পর সে আশা করেছিল, তার স্ত্রী খোদা-ভিতু হবে। কিন্তু যত দিন গেছে তার এ আশা নির্বাপিত হয়ে নিরাশায় পরিণত হয়। উপন্যাসের শেষে দেখা যায় প্রকৃতিতে খুব ঝড় ওঠে। এ ঝড় আসলে এক পরিবর্তনের বার্তাবাহী। সেই ঝড়-বৃষ্টির রাতে মাজারের কবরের উপর জমিলার মেহেদি রঞ্জিত পা -আসলে ধর্মের ষণ্ড, ভন্ড মজিদ ও পিতৃতান্ত্রিকতার বিরুদ্ধে প্রতিকী-প্রতিবাদ।

বাংলার প্রত্যন্ত অঞ্চলের নারীরা পুরুষের সহধর্মী ও সহমর্মীই শুধু নয়, তারা সহকর্মীও বটে। ধান থেকে চাল তৈরির স্তর গুলি অর্থাৎ ধান এলানো, মাড়ানো, সিদ্ধ করা, ভানা —এগুলো সব ঘরের নারীরাই করত। কিন্তু এত করেও পুরুষের চোখে নারীর অবস্থান ছিল মানব-মানাঙ্কের নীচে। মহব্বত নগরের আর্থ-সামাজিক পরিচয় দিতে গিয়ে লেখক উল্লেখ করেছেন—

"গ্রামের লোকগুলি ইদানীং অবস্থাপন্ন হয়ে উঠেছে। জোতজমি করেছে, বাড়িঘর করে গরু-ছাগল আর মেয়েমানুষ পুষে চড়াই-উতরাই ভাব ছেড়ে ধীরস্থির হয়ে উঠেছে।"[২৯]

অর্থাৎ গরু-ছাগলের মতো নারীরাও ছিল পরিবার কর্তাদের প্রয়োজনের পোষ্য! ফলত, রমণীগণকে (রমণ+ঈ) বিচিত্র বারমাস্যা সাথে নিয়ে, অযত্নের আচ্ছাদনে মোড়া জীবনের পুঁটুলি বয়ে স্বামীর চরণে স্মরণ নিতে হয়। তাই ক্ষমতাবলে খালেক ব্যাপারী তার স্ত্রীকে সহজেই ত্যাগ করতে পারে, তাহেরের বাপ হাসুনির মাকে ঠ্যাঙাতে পারে, মজিদ একাধিক বিয়ে করতে পারে, আবার জিনে ধরার অজুহাতে মাজার ঘরে জমিলাকে পোষ্যের মতো বেঁধেও রাখা যায়! উপন্যাসে আমেনাকে গ্রামের প্রাণী; জমিলাকে হরিণ, ইঁদুর, বিড়ালছানা; খতনা করা ছেলেটিকে কোরবানির ছাগল; দুদু মিঞাকে ঘাড়-পিঠ সমান করা গাধার সঙ্গে তুলনা করে তাদের সামাজিক অবস্থানকে স্পষ্ট করা হয়েছে।

গ্রামের মানুষ একদিকে যেমন শান্ত, সহিষ্ণু, নিরীহ, নির্বিরোধ তেমনি সময়ে সময়ে তাদেরও চিত্ত-বিক্ষোভ ঘটে। তখন তারাই মেতে ওঠে বিবাদ-বিসংবাদ এমনকি নরহত্যাতেও। তাহের-কাদেরের বুড়ো বাবা-মা'র মতো গ্রামের একান্নবর্তী পরিবারে মাঝে মধ্যে কর্কশ-কলহ বেধে যায়। তাহেরের মা নিজের বিবাহ-বহির্ভূত সম্পর্কের কথা ঘোষণা করে স্বামীর সঙ্গে বিবাদে বিজয়ী হতে চেয়েছে—

"ভাবছস্ বুঝি পোলাগুলি তোর জন্মের? আল্লা সাক্ষী—হেগুলি তোর জন্মের না, তোর জন্মের না!"[৩০]

একথা শুনে তাহের-কাদের নিজ মা-কে ঠ্যাঙানোর নিদান দেয়। আবার এই 'মা' চরিত্র হাসুনির মা-কে তথা তার নিজ বিধবা কন্যাকে স্বামীর মৃত্যুতে অভিযুক্ত করে বলেছে,

"খানকির বেটি নিকা করবো বলাই তো মানুষটারে খাইছে!"[৩১]

পারিবারিক এই বিবাদের কথা মজিদের কানে ওঠায় বুড়ো নিজ কন্যাকে "ওরে ভাতার-খাইগা জারুণি"[৩২] বলে সম্বোধন করে তাকে প্রবল প্রহার করে। এখানে স্বামী-স্ত্রী, মাতা-পুত্র, পিতা-কন্যা সম্পর্কের সামাজিক অবক্ষয়ের দিকটি উঠে এসেছে। উপন্যাসে মুসলমান সমাজের সতীন-সংসারের প্রসঙ্গ থাকলেও সেখানে চেনা বিরোধ, বিবাদ, বিষাদ নেই, বরং আছে শান্তিপূর্ণ সহাবস্থান। 'লালসালু' উপন্যাসে শিক্ষার দিক দিয়ে মুসলমান সমাজের তিনটি শ্রেণির কথা উঠে আসতে দেখা যায়। যথা— এক. উপন্যাসের প্রথমে নামহীন শিকারী ব্যক্তি ও আক্কাস, নবোদিত শিক্ষিত মধ্যবিত্ত মুসলমান শ্রেণির প্রতিভূ। দুই. মজিদের মতো মাদ্রাসায় পড়া শিক্ষিত, কর্মহীন বেকার ও অনিকেত শ্রেণি। তিন. উভয় প্রকার শিক্ষা পদ্ধতি থেকে বঞ্চিত সাধারণ নিরক্ষর মানুষ, উপন্যাসে যাদের সংখ্যা সবচেয়ে বেশি। উপন্যাসে এক পিরের মুরিদ "পশ্চিমে এলেম শিখে এসে অবধি বাংলা জবানে কথা কয় না"[৩৩]। অর্থাৎ এখানে আধুনিক শিক্ষা ও মাদ্রাসা শিক্ষার দ্বন্দ্বের মতোই ভাষার প্রশ্নেও মুসলমান সমাজের দোলাচল অবস্থানের বিষয়টি স্পটভাবে তুলে ধরা হয়েছে।

পূর্ববঙ্গের কৃষিপদ্ধতি ওই সমাজের সমাজ-সংস্কৃতির পরিচায়ক। সেচ-ব্যবস্থা না থাকায় গ্রীষ্মকালে রাত-দিন কোঁদে করে জল তুলে জমি প্রস্তুত করা, হাল দেওয়া, চারা ছড়ানো, সারি দিয়ে গলা ছেড়ে গীত গেয়ে ধান কাটা প্রভৃতি চাষাবাদ পদ্ধতি 'লালসালু' উপন্যাসে বর্ণিত হয়েছে। এছাড়া মহিলাদের কাঁথা সেলাই, পাটি বোনা, কোঁচ দিয়ে ধান ক্ষেতে মাছ ধরা; পিরের মন্ত্রপূত জল, তাবিজ, শুভ-অশুভে বিশ্বাস, জিন-পরিতে বিশ্বাস; চিড়া-গুড়, ফিরনি প্রভৃতি খাদ্য; ছাগল-মুরগি প্রভৃতি পোষ্য; নিত্যব্যবহার্য বদনা; অতিথিকে পান দান; মজিদের পরিধেয় কোর্তা, পাগড়ি; মাজারে মোমবাতি জ্বালানো, সিন্নি দেওয়া, আতর মাখা; নিমের দাঁতন করা এবং সর্বোপরি ভাষায় সুপ্রচুর আরবি-ফারসি শব্দের ব্যবহার ইত্যাদির মধ্য দিয়ে ওই অঞ্চলের সংস্কৃতির এক বাস্তবরূপ 'লালসালু' উপন্যাসে ফুটে উঠেছে।

চার

আবু ইসহাক তাঁর প্রথম উপন্যাস 'সূর্য-দীঘল বাড়ী' রচনার মধ্য দিয়েই প্রবল প্রতাপের সঙ্গে নিজের উপস্থিতি জানান দিয়েছিলেন। মাটির গন্ধ লেগে থাকা এই উপন্যাসের মধ্যে 'freshness' লক্ষ্য করেছিলেন অন্নদাশঙ্কর রায়। সময়ের খরস্রোতে মানুষের দ্বন্দ্বমথিত যাপনচিত্র এবং স্বপ্ন ও স্বপ্নভঙ্গের দলিলীকরণ ঘটায় অনেকেই এটিকে 'স্কেচ ধর্মী' উপন্যাস বলে অভিহিত করেছেন। আর তৎকালীন সমাজে রংচটা প্রান্তিক জীবন নিয়ে টিকে থাকার প্রণোদনা, মন্বন্তরে না মরা মানুষের মর্মান্তিক, মর্মন্তুদ যান্ত্রিক যাচ্ঞা ও যাতনা, এবং মানুষের সৎভাইদের ব্যঙ্গ-চিত্র ও বিকৃত রূপ ধরা পড়েছে মূলত জয়গুন চরিত্রের মধ্য দিয়ে।

জব্বর মুন্সীর মৃত্যুর পর জয়গুনের বিয়ে হয় করিমবকশের সঙ্গে। কিন্তু দুর্ভিক্ষের বছরে করিমবকশ তাকে তালাক দিলে পেটের ক্ষুধা মেটাতে জয়গুন নিজের বাড়ি বিক্রি করে সন্তানদেরকে নিয়ে গাছতলায় দাঁড়ায়। সে বছর এক বাটি ফ্যান বা একটু খিচুড়ির জন্যে তাকে লাইনের দীর্ঘ কিউ'তে দাঁড়াতে হয়েছিল। তারপর গ্রামে ফিরে এসে অগত্যা তারা সূর্য-দীঘল বাড়ির ঝুপড়িতে আশ্রয় নেয়। জয়গুনরা শহর থেকে আবার গ্রামে ফিরে আসে; কিন্তু তাদের এই ফিরে আসাটা জীবনানন্দ কথিত শঙ্খচিল বা ভোরের কাক হয়ে 'বাংলার নদী মাঠ ক্ষেত ভালবেসে' ফিরে আসা ছিল না। কারণ দ্বিজেন্দ্রলালের 'ধনধান্যে পুষ্প ভরা', 'নবান্নের দেশ' তখন নিরন্নের দেশে, এবং 'রূপসী বাংলা' তখন উপোসী বাংলায় পরিণত। শহরে ভাতের লড়াইয়ে তারা পরাজিত কিন্তু একেবারে পর্যুদস্ত নয়, তাই আবার তারা গ্রাম অভিমুখে যাত্রা শুরু করে। এখান থেকেই শুরু হয়েছে এই উপন্যাসের কাহিনি।

মন্বন্তর পরবর্তী কালে "এক জিল্লাকা চাওয়াল দুসরা জিল্লামে যানে"[৩৪] নিষেধাজ্ঞা ছিল। আর কেউ চাল সহ ধরা পড়লে সিপাইদের পকেটে চাল ঢেলে দিয়ে ছাড় পাওয়া যেত। উপন্যাসের প্রধান চরিত্র তালাকপ্রাপ্ত সর্বহারা জয়গুনও অনন্যোপায় না দেখে, সমাজ ও ধর্মের অনুশাসন না মেনে, ভিখারি বেশে প্রশাসনকে ফাঁকি দিয়ে পাঁচ টাকাকে মূলধন করে লালুর মা, গেদির মা'দের সাথে শহর থেকে চাল চোরাচালান কর্মে প্রবেশ করে। কারণ সারভাইভাল অফ দ্য ফিটেস্ট - এর নিয়মানুযায়ী সময়োপযোগী 'টু একজিস্ট ইজ টু চেঞ্জ' না করতে পারলে নির্মূল হবার বিপুল সম্ভাবনা। জয়গুন হয়ত এত শত তত্ত্বকথা জানে না, তবু দিনের শেষে এটা সে বোঝে উপার্জন না করলে সন্তানদেরকে নিয়ে তাকে অকালেই মহাকালে পাড়ি দিতে হবে। আর এই দীর্ঘ, দৃঢ় উপলব্ধিতে তার মনে হয়েছে,

> "জীবন রক্ষা করাই ধর্মের প্রথম ও শ্রেষ্ঠ মূল মন্ত্র।"[৩৫]

আর তাই –

> "উদরের আগুন নিবাতে দোজখের আগুনে ঝাঁপ দিতেও তার ভয় নেই।"[৩৬]

বারো বছরের হাসু স্টেশনে মোট বওয়া কাজ করে। আর শফীর মা দশ দুয়ারে চেয়ে এক দুয়ারে বসে খাওয়ার জন্য ভিক্ষা শুরু করে, কিন্তু "দুর্ভিক্ষে কে দেয় ভিক্ষে?"[৩৭] তাই অনাহারে, অর্ধাহারে তার দিন কোনও মতে খুঁড়িয়ে খুঁড়িয়ে চলতে থাকে। কিন্তু এত সংগ্রাম সত্ত্বেও সূর্য-দীঘল বাড়ির মিথের মধ্য দিয়ে তাদেরকে আবার গ্রাম ছাড়তে হয়। তারা আবার এগিয়ে চলে খোদার বিপুলা পৃথিবীতে মাথা গোঁজার জায়গা খুঁজবে বলে। তবে–

> "হেথা নয়, অন্য কোথা, অন্য কোথা, অন্য কোনখানে!"[৩৮]

আবু ইসহাকের কলমে অশিক্ষিত নিম্নবিত্ত মুসলমান পরিবারের পিতৃতান্ত্রিকতা ও মধ্যযুগীয় মনোভাবনা ধরা পড়েছে। এই উপন্যাসে বউ পেটানো করিমবকশ যেমন পূর্ববঙ্গের গরিব মুসলমান সমাজের প্রতিভূ, তেমনি মেহেরন স্বামীর পদতলে বেহেস্ত খুঁজতে গিয়ে চোরাবালিতে হারিয়ে যাওয়া নারীদের একজন মাত্র। ছয় বছরের দাম্পত্য সম্পর্কে জয়গুনকেও নিরন্তর নির্যাতন সইতে হয়েছিল। স্বামীর অকথ্য অত্যাচারে শাশুড়ির সান্ত্বনা বাণী স্বামী "যেই আতে, যেই পায় মারব, বেবাক বিস্তে যাইব।"[৩৯] করিমবকশের ঘরে ঋতুবদলের মতো ঘরে বউ বদল হয়– মেহরান, জয়গুন, আঞ্জুমান। গ্রাম-বাংলায় নারীর পর্দার বিধান ও তালাকের অপব্যবহার পিতৃতান্ত্রিকতাকে মজবুত করেছে। বালিকা মায়মুন প্রথম রাতে স্বামীর ঘরে চিৎকার করায় তাকে মায়ের ঘরে পাঠিয়ে দেওয়া হয়। আর এতে করে জয়গুন, শফীর মা সকলে মায়মুনকেই দোষারোপ করে।

> "পুরুষের ঘরই মাইয়ালোকের হাপন ঘর।"[৪০]

দুর্ভিক্ষের দুরতিক্রম্য বছরে করিমবকশ জয়গুন ও মায়মুনকে ত্যাগ করে কিন্তু কাসুকে কাছে রেখে দেয়। কারণ–

> "পুত্র সে হাতের লাঠি বংশের চেরাগ।
> কন্যা সে মাথার বোঝা কুলে দেয় দাগ।।"[৪১]

তৎকালীন সমাজে পুত্র ও কন্যাকে কী বিশাল বিষম দৃষ্টিতে দেখা হত, এই পয়ারের মধ্য দিয়ে তার একটি নমুনা উঠে এসেছে। ধর্মীয় বিশ্বাস থেকে জয়গুন তার হাঁসের প্রথম ডিম মসজিদে পাঠিয়েছিল, কিন্তু ইমাম সাহেব জয়গুনের বাড়ির ডিম শুনে বলেন-

> "তওবা! তওবা! হারাম! হারাম! ফিরাইয়া দ্যাও অহুনি। বেপর্দা আওরতের চিজ।"[৪২]

এভাবেই হুজুর কর্তৃক মজুরের বাড়ির ডিমকে প্রত্যাখ্যান করা, জয়গুনকে জোরপূর্বক তওবা করানো, পিতৃব্য কর্তৃক হাসুদের সম্পত্তির ভোগদখল কিংবা জয়গুনের রিরংসার স্বীকার হওয়ার মধ্য দিয়ে সমাজের ভগ্নরূপের নগ্নায়ণ ঘটানো হয়েছে। আবু ইসহাকের এই উপন্যাসে প্রান্তিক, প্রতারিত, প্রলেতারিয়েত; ষড়যন্ত্রের জালে শিকলাবদ্ধ জয়গুনের দুর্মর দৃঢ়তা গ্রামীণ নারী আত্মশক্তির স্বরূপ ও বেঁচে থাকার জীবন্ত ব্যাকরণ হয়ে উঠে এসেছে।

'সূর্য-দীঘল বাড়ী' উপন্যাসের একটি কথাপ্রসঙ্গ (context) আছে। সেটি হল পঞ্চাশের মহামন্বন্তর ('The great Bengal Famine')। এই মন্বন্তরের প্রসঙ্গ সূত্রে ড. অমর্ত্য সেন তাঁর গ্রন্থে উল্লেখ করেছেন -

> "It seems safe to conclude that the disastrous Bengal famine was not the reflection of a remarkable over-all shortage of foodgrains in Bengal."[৪৩]

খাদ্য সংকটের কারণেই মন্বন্তরের সৃষ্টি হয়েছিল এমন কথা হয়তো বলা যায় না। বরং এই দুর্ভিক্ষ ছিল স্বার্থান্বেষী একদল মানুষের তৈরি করা এক গভীর ও বৃহৎ ষড়যন্ত্র। তৎকালে বঙ্গদেশে 'পৌনঃপুনিক দুর্ভিক্ষ' হত। তবে দৈত্যের মতো বাংলার ঘাড়ে ভর করা পঞ্চাশের মন্বন্তর ছিল সর্ববৃহৎ, এতে মৃত্যু হয়েছিল প্রায় ত্রিশ লক্ষ মানুষের। এই দুর্ভিক্ষের দীনতা উত্তরাধিকারসূত্রে ঘাড় বদল করে চলেছিল; আর এর সঙ্গে যুক্ত হয়েছিল শোথ, আমাশা, কলেরা, ম্যালেরিয়ার মহামারি। সাথে কুইনাইন সহ অন্যান্য ওষুধ সংকট ও বস্ত্র সংকট। উপন্যাসে উল্লিখিত চালের দর সর্বোচ্চ চল্লিশ টাকা হওয়া, কলেরা-বসন্তের ভয়ে খোদাই শিরনি দেওয়া, বস্ত্রাভাবে বিয়ের শাড়ি দিয়ে জয়গুনের শিশু সন্তানকে কবরস্থ করা —এসবই সেই সময়ের সমাজ-বাস্তবতা চিত্রের হিমশৈল মাত্র। আর এই সমূহ সংকটের বর্ণনা লেখকের স্বকপোলকল্পিত নয়, বরং তাঁর প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতাজাত। কারণ বাস্তব অভিজ্ঞতা ছাড়া-

> "তাদের মতন ভাষা কথা/কে বলিতে পারে আর।"[৪৪]

সূর্য দীঘল বাড়ী উপন্যাসে প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে দাঙ্গা, দেশবিভাগের কথা এসেছে। দেশ বিভাগের ফলে হাসুরা খুশি হয়েছিল, তাদের আশা ছিল—

> "দ্যাশ স্বাদীন অইল। এইবার চাউল হস্তা অইব। মানষের আর দুকখ থাকব না।"[৪৫]

কিন্তু কিছুদিন যাবার মধ্যেই তারা উপলব্ধি করতে পারে যে, স্বাধীনতা 'বেবাক ফাঁটকি'। চালের দাম, রেলের ভাড়া বেড়ে গেছে; খাজনা মকুব হয়নি, চিনি ও চালের দুর্নীতি বেড়েছে বই কমেনি। ছেচল্লিশের দাঙ্গায় রশিদ কন্ট্রাকটরের ছেলের মৃত্যু এবং সাতচল্লিশে তাদের দেশ বদল, রমেশ ডাক্তারের স্ত্রীর আক্রান্ত হওয়ার আশঙ্কার মধ্য দিয়ে দেশ ভাগের ফলে সংখ্যালঘুদের মনে আশা ও আশঙ্কার দ্বিবিধ সঞ্চারণ— আবু ইসহাকের সূক্ষ্ম শৈল্পিক তুলির টানে ভাষারূপ লাভ করেছে।

তৎকালীন সমাজে ডাক্তারের চেয়ে মৌলবি, ফকিরের কদর ছিল বেশি। পান দিয়ে তুক করা; ভূত-প্রেত, জিন-পরি, তাবিজ, শুভ-অশুভ বিশ্বাস; চাঁদ দক্ষিণ মুখে কাত হয়ে উঠলে বন্যা হয়, আর উত্তরমুখে কাত হয়ে উঠলে দেশে মড়ক লাগে, কলেরা-বসন্ত হয়; দুধে জল মেশালে বাছুর মারা যায়; কলেরা-বসন্ত থেকে রেহাই পাওয়ার জন্য খোদাই শিরনি দেওয়া, বসন্ত হলে সোনা-রূপার জল দিয়ে স্নান করানো, কবরে মোমবাতি দেওয়া, হিন্দুর হরিলুট, মুসলমানের শিরনি বিতরণ প্রভৃতি পূর্ববঙ্গের মানুষের বিভিন্ন বিশ্বাস ও আচার-আচরণ তথা সংস্কৃতি উপন্যাসকে সমৃদ্ধি দান করেছে। উপন্যাসে আছে বাড়ির বয়স্করা ছোটদেরকে ভয় দেখানোর জন্য কীভাবে গোঙাবুড়ি, ছালাবুড়ির গল্প শোনাতেন। এছাড়াও বর্ণিত হয়েছে বিভিন্ন শোলক ভাঙার কথাও। একটি শোলক যেমন—

> "মাছ করে ঝক ঝক ছোট্ট এক ঝিলে।
> একটা মাছে টিপ দিলে বেবাকগুলো মিলে।।"[৪৬]

এই শোলকের অর্থ হল— হাঁড়ির ভাত।

পূর্ববঙ্গ কৃষিপ্রধান দেশ হওয়ায় উপন্যাসে বিভিন্ন প্রকার ধান, পাট, মশুর, কলাই, শরষে প্রভৃতির দেখা মেলে। ঝিঙ্গাশাইল ধানে মুড়ি ভালো, বাঁশফুল ধানে ভাত ভালো, লাহি ধানের খই ভালো আবার কোনও ধানে পিঠে ভালো হয়। পূর্ববঙ্গের মানুষের খাদ্য— গন্ধ ভাদাল শাকের বড়া, মাছ, ফ্যান-ভাত, কচুর লতির চচ্চড়ি, ডাঁটা শাক; লবন, মরিচ পোড়া দিয়ে পান্তা ভাত, শাক পাতার সঙ্গে অল্প চাল দিয়ে রান্না জাউ; আখ, আম; এছাড়া রসগোল্লা, সন্দেশ, পানতুয়া প্রভৃতি মিষ্টির কথা উল্লেখ আছে। মায়মুনের বিয়ের মধ্য দিয়ে বিবৃত হয়েছে প্রান্তিক মুসলমান সমাজের বিবাহ-বৃত্তান্ত। যেমন—

বিয়ের দিনক্ষণ নির্ণয়, বিয়ের খাদ্য— শোল মাছ দিয়ে কদু ঘন্ট, ডাল আর দুধ বাতাসা; বরযাত্রীদের বসার আসন হিসেবে হোগলা পাতা, তাদের পা ধোওয়ার জন্য জলচৌকি, কলসি, বদনা ও খড়মের ব্যবস্থা; বরের পোশাক— লুঙ্গি, পাঞ্জাবি ও টুপি; বিয়ের গয়না— নোলক, নাকফুল, কানফুল, হাতে বয়লা, পায়ে ব্যাঁক খাড়ু, গোল খাড়ু ইত্যাদি উপকরণ। জয়গুনদের গ্রামে নতুনের চেয়ে পুরনো জুতো ও পুরনো চাদরের মর্ম বেশি। এসব পুরনো জিনিসের মধ্যে আছে আভিজাত্য, বনেদিপনা। এভাবেই উনিশটি পরিচ্ছেদে বিন্যস্ত 'সূর্য-দীঘল বাড়ী' উপন্যাসে পূর্ববঙ্গের সমাজ-সংস্কৃতির এন্তার উপাদান নিপুনভাবে ধরা পড়েছে।

পাঁচ

ঔপন্যাসিক শওকত ওসমান নিজেকে 'সমাজের মুর্দাফরাস'[৪৭] বলে পরিচয় দিলেও পূর্ব-পাকিস্তানের সামরিক শাসনের সময় মানুষের স্বাধীনতা হরণ ও শোষণের বিরুদ্ধে তিনি সরাসরি সোচ্চার হতে পারেননি। ফলে স্বভাবতই তাঁর প্রতিবাদ হয়েছে রূপকধর্মী। এ প্রসঙ্গে তিনি অকুণ্ঠিতভাবে স্বীকার করেছেন—

> ''জালেমদের মুখোমুখি দাঁড়াতে পারি নি তা— মেনে নিতে আমার এতটুকু দ্বিধা নেই।''[৪৮]

নিজের অকুতোভয়তার অভাব এমন নিরাবরণ ও নিরাভরণ ভঙ্গিতে স্বীকারকারী শওকত ওসমানের বিশিষ্ট রূপকাশ্রয়ী উপন্যাস 'চৌরসন্ধী'র মধ্য দিয়ে স্বপ্নভঙ্গের সওদাগর দুই খান শাসকের শাসন-শোষণ এবং সদ্য গঠিত পাকিস্তানের সমাজরূপ উন্মোচিত হয়েছে। ঢাকাকে বলা হয় রিকশার রাজধানী। উপন্যাসে রিকশা চালক, ঠেলাগাড়ি চালক, সাধারণ মজুর, জোগাড়ে, কুলি প্রভৃতি পূর্ববঙ্গের শ্রমিক শ্রেণির কথা ভাষারূপ লাভ করেছে। কাল্লুর মতো মজুর শ্রেণির মানুষ সারাদিন হাড়ভাঙা খাটুনির পর দেহে তাগদ আনার জন্য সন্ধ্যায় এক দেশি তাড়ির দোকানে জমায়েত হয়। দোকানের চারিদিকে মূত্রের দুর্গন্ধ, মাছির ভনভন। এই মজলিসে তারা ভাঁড়ে করে তাড়ি পান করে, নাচে, তবলা বাজায়, গান ধরে, কেউ বা সরস রসিকতা করে।

উপন্যাসের প্রধান চরিত্র কাল্লু মহাজনের থেকে রিকশা ভাড়া নিয়ে ঢাকা শহরে রিকশা চালায়। মহাজনের প্রতিদিনের ভাড়া প্রতিদিনেই শোধ করতে হয় তাকে। এই তাড়ির আড্ডায় বেচু সর্দারের (সিফিলিস রোগাক্রান্ত) আহ্বানে ইস্পাতের মতো দেহ বিশিষ্ট কাল্লু চোরের দলে প্রবেশ করে। আর্থিক দিকের পাশাপাশি আত্মিক দিকটাও তার পেশা ছাড়ার বড়ো কারণ—

> ''কত খানকীর পুৎ ত তার বয়সের ইজ্জত রাখে না, পেশা রিক্সাওয়ালা ব'লে।''[৪৯]

রিকশা চালানো ছেড়ে কাল্লু চোরেদের দলে ঢুকে প্রথমে ছিঁচকে চুরি শুরু করে। তারপর যখন ''দ্বিতীয় মহাযুদ্ধ লাগল ইউরোপে,''[৫০] আর দেশে ''নানা রকমের চুরি হঠাৎ গজিয়ে উঠল''[৫১] ঠিক তখনই কাল্লুর বড়ো চুরিতে হাতে খড়ি। এখানে মানুষের দুর্বৃত্ত হয়ে ওঠার ইতিকথা ও তার পরের কথা কাল্লুর মধ্য দিয়ে দেখিয়েছেন ঔপন্যাসিক। স্বদেশে মন্বন্তর ও বিদেশে মহাযুদ্ধের মহারণ 'চৌরসন্ধি'র প্রথম অংশের প্রেক্ষাপট হিসেবে দাঁড়িয়ে আছে। আর কাহিনি শেষ হয়েছে ভারত বিভক্তির পর পূর্ব পাকিস্তানে সামরিক শাসনের বর্ণনার মধ্য দিয়ে। দেশে তখনও মন্বন্তরের ক্ষত শুকিয়ে যায়নি, এরই মধ্যে অস্ত্রে অস্ত্রে মরণের উন্মাদ রাগিনী বেজে উঠল। ফলে বিদেশের পাশাপাশি স্বদেশেও তৈরি হল অস্থির অরাজকতা—

> ''জোরেসোরে দ্বিতীয় মহাযুদ্ধ লেগেছে। দেশময় জিনিসের টানাটানি। কাপড়, চাল, ধান, নিত্য ব্যবহার্য দ্রব্যের টানাটানি। তার ফল, জান নিয়ে টানাটানি। ইজ্জৎ নিয়ে টানাটানি।''[৫২]

বিশ্বযুদ্ধের এই অস্থির সময়ে ঢাকার এক কাপড় কলে টানা একমাস ধরে ধর্মঘট শুরু হলে কলের মালিক (আইনসভার সদস্য) ও কলের ম্যানেজার কাল্লু মস্তানকে টাকা দিয়ে সেই ধর্মঘট ভেঙে দেন। এছাড়া কাল্লুর সাহায্য নিয়ে উক্ত কলের মালিক রাজনৈতিক কর্তৃত্ব করায়ত্ত করেন। এই কাল্লু মস্তানের সঙ্গে থানার বড়ো বাবু থেকে শুরু করে উকিল, আইনসভার সদস্য সবার আর্থিক আঁতাতের মধ্য দিয়ে; চালকুমড়োর ছাঁচে বেড়ে ওঠা পচা-গলা সমাজের অভ্যন্তরীণ অবয়বের নগ্নরূপ উন্মুক্ত হয়ে ওঠে।

আতহার উকিল, তাঁর স্ত্রী কুব্রা (বি.এ পাস), সয়ীদ —এদের নিয়ে গঠিত হয়েছে 'চৌরসন্ধি' উপন্যাসের উপকাহিনি। আতহার আলি শহরের বিখ্যাত উকিল এবং একদা ঝানু পাবলিক প্রসিকিউটার, বড়ো বড়ো জজের সঙ্গে তাঁর 'সুসম্পর্ক'। এখানে পরোক্ষে বিকিয়ে যাওয়া বিচারব্যবস্থার প্রতি সূক্ষ্ম ইঙ্গিত আছে। আতাহার উকিলের স্ত্রী কুব্রা সম্পর্কে জড়ায় বিবাহিত

সয়ীদের সঙ্গে। ওদিকে ব্যবসার নানা অনৈতিকতার পাশাপাশি সয়ীদ কালোবাজারির সঙ্গেও যুক্ত। এই যুগলের চিঠির উত্তর-প্রত্যুত্তরের মধ্য দিয়ে তৎকালীন পূর্ববঙ্গের সামাজিক, রাজনৈতিক, অর্থনীতির পরিচয় পাওয়া যায়। কুব্রাকে লেখা সয়ীদের পত্রের অংশ বিশেষ যেমন—

> "শহর ছাড়ালেই দেখবে দারিদ্র্যের কি কুৎসিৎ চেহারা। গ্রাম কেন, শহরেই দ্যাখো। ঈদের মাঠে মুসল্লীর চেয়ে ভিখিরীর সংখ্যা বেশী।"[৫৩]

স্ত্রী কুব্রার এই বিবাহবহির্ভূত সম্পর্কের কথা জেনেও আতহার উকিল তাকে কিছু বলতে পারেননি। কারণ তিনি নিজেও এক সম্পদশালী বিধবার প্রেমে জড়িয়ে পড়েছেন। এই অংশে নবোত্থিত শিক্ষিত মধ্যবিত্ত মুসলমান পরিবারের বিবাহবহির্ভূত সম্পর্কের বহুস্তরীয় জটিল-জাল আবর্তিত হতে দেখা যায়।

শওকত ওসমানের আলোচ্য উপন্যাসের প্রথমেই কাল্লুর উক্তির মধ্য দিয়ে একই সঙ্গে শহুরে মুসলমান নারীর সামাজিক অগ্রগতি এবং অন্যদিকে পিতৃতান্ত্রিকতার রিরংসার নগ্নরূপ পরিলক্ষিত হয়—

> "আগে এই শহরে বেরোত দু'-চারটে হিন্দু মেয়ে। সব হাঁ করে চেয়ে থাকত। এখন মুসলমান মেয়েদেরই রকম দ্যাখো। আর হাঁ করতে হবে না। কোনটা ছেড়ে কোনটা দেখবে? ডাইনে বাঁয়ে আগায় পাছায় - চোখ খুলেছ কি মেয়ে, আর কওমী মেয়ে।"[৫৪]

তৎকালীন ঢাকা শহরে মধ্যবিত্ত মুসলমান নারীর কিছুটা সামাজিক অগ্রগতি ঘটলেও, বৃহত্তর নারী সমাজ সম্পর্কে বৃহত্তর পুরুষ সমাজের চিন্তা-ভাবনায় তখনও কোনও পরিবর্তন আসেনি। কাল্লু তার চোদ্দ বছরের কন্যা সুরৎজনের বিয়ে দিতে ব্যাকুল। কারণ—

> "হাতী পোষা যায়, মেয়ে পোষা যায় না। শহরে কেলেঙ্কারী বড় বেড়ে গেছে।"[৫৫]

কাল্লুর মতে—

> "নারী-ইলেম আর কতই বা কাজে লাগতে পারে?"[৫৬]

এই ভাবনাতেই কাল্লু তার মেয়েকে স্কুলে পাঠায় না, পরিবর্তে তাকে এক স্কুল শিক্ষিকার বাড়িতে নামমাত্র কিছু বাংলা লেখা-পড়া শেখার জন্য পাঠায়।

শওকত ওসমান সমাজতাত্ত্বিক দৃষ্টিতে, একই সঙ্গে ঢাকার শহুরে জীবন-যাপন ও অন্যদিকে ধাঙড়পল্লির বস্তিবাসীদের জীবন চিত্র তুলে ধরেছেন, বেঁচে থাকার বৈষম্যময় বৈপরীত্যকে স্পষ্ট করার জন্য। ধাঙড়পল্লির বস্তির পাশে পাওয়া যাবে পাঁটার বোঁটকা গন্ধ, মূত্রের দুর্গন্ধ, কাঁচা গোবরের গাদি, শূকরের গঁৎ গঁৎ শব্দ। এই ধাঙড়েরা জ্যোৎস্নালোকিত রাতে নারী-পুরুষ নির্বিশেষে পচুই কি হাড়িয়া খেয়ে ডুগডুগি বাজিয়ে সমবেত কণ্ঠে গান করে, আর প্রাণোদ্দামতার সঙ্গে নৃত্যে মেতে ওঠে। ধাঙড় পল্লির বৃদ্ধ মোড়লের গায়ের চামড়া এত ঢিলা যে, তা ছাগলেও খেতে পারে। যদিও ধাঙড়েরা তাদের প্রান্তিক পরিণতিতেও অসৎ পথে উপার্জন করে না, কাল্লুর মতো চুরি করে না। তাদের এই স্বাভাবিক জীবন-সংগ্রাম দেখে কাল্লুর মনে হয়েছে, "এমন ধাঙড় হোলে ক্ষতি কি ছিল?"[৫৭] ঔপন্যাসিক এখানে কাল্লুর উক্তির মধ্য দিয়ে যেন অর্থ, কীর্তি, স্বচ্ছলতার বাইরেও জীবনের যৌক্তিকতাকে খুঁজে পেতে চেয়েছেন।

সত্তর পাতা বিস্তৃত এই উপন্যাসের শেষের অংশটি ঐতিহাসিক ভাবে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ। আজাদ পাকিস্তান গঠিত হওয়ার পর ঘটনাক্রমে দেখা যায় যে, কাল্লুর লোক যেখানে চুরি করতে গেছে সেখানে আগে থেকেই আর একদল চোর চুরি করছে। এমতাবস্থায় একদিন কাল্লুর সঙ্গে সাক্ষাৎ হয় অপর চোর দলের সর্দার গফুরের। তারপর তাদের দুজনের মধ্যে নানা বিষয়ে কথা হয়। এবং এর তিনদিন পর তারা কথামত হোটেল কাবেরীতে উপস্থিত হয়। কাল্লুকে আপ্যায়ন করার জন্য গফুর আগেই পৌঁছে গিয়েছিল। তারপর অঢেল পিনা ও খানার পর মূল কথা শুরু হয়। কাল্লু বলে, ভাইয়ে ভাইয়ে বিবাদ করলেই সব বরবাদ হয়ে যাবে। ফলে গভীর রাতে দুই সর্দার চৌরসন্ধি করে—

> "তোমরা একদিকে চুরি করো, আর আমরা এক দিকে চুরি করি। ফ্যাসাদ থাকবে না।"[৫৮]

কাল্লু শহরের পূর্বদিক ও গফুর শহরের পশ্চিমদিকে চুরির কারবারি ভাগাভাগি করে নেয়। প্রসঙ্গত, এখানে কাল্লুর আড়ালে পূর্ব পাকিস্তানের মোনেম খান ও গফুরের আড়ালে আয়ুব খানকে চিত্রিত করা হয়েছে। এই চৌরচুক্তির পর গফুর তার 'বুইক' (চারচাকা) গাড়িতে কাল্লুকে আহ্বান করে ও বলে,

''আমি আপনার ড্রাইভার আজ থেকে। আমাকে শুধু মনে রাখবেন'।'[৫৯]

গফুরের এই কথার তাৎপর্য হল— আজ থেকে পূর্ব পাকিস্তানকে ড্রাইভ করবে পশ্চিম পাকিস্তান ও তার শাসক। কাল্লুকে লোকে চেনে ''কাল্লু গুণ্ডা'' নামে। গুণ্ডা শব্দটি দেশি, কাল্লুর পোশাক, মাথায় কিস্তি টুপি, পরনে পায়জামা, পাঞ্জাবি। ফলে কাল্লুর আড়ালে পূর্ব পাকিস্তানের মোনেম খানকে অনায়াসে চিনে নেওয়া যায়। আর গফুরকে লোকে বলত 'গফুর বদমাস'। 'বদ' শব্দটি ফারসি। আর গফুরের শূন্য শির, পরনে প্যান্ট, স্যুট, টাই। এখানে গফুরের আড়ালে আয়ুব খান চরিত্র স্পষ্ট হয়ে ওঠে। সেই সময় পাকিস্তানের দুই শোষকের শাসনের সন্ধিতে পদানত প্রজাবর্গের জীবনে নেমে এসেছিল জাতীয় সংকট। কিন্তু মাত্র দুই যুগের ব্যবধানেই ভেঙে যায় সেই সন্ধি, 'বাংলাদেশের হৃদয় হতে' উঠে আসা আন্দোলনের পরিপ্রেক্ষিতে রচিত হয় নতুন দেশ-কাল-সীমানা।

উপন্যাসে শহরের বস্তু-সংস্কৃতি'র (material culture) প্রচুর উপাদান আছে। যেমন কাল্লুর বাড়ির চেয়ার,সোফা, মায় আইড টেবিল ইত্যাদি। এছাড়া উকিলের হাতের দামি আংটি; তাঁর দো-তলা বাড়ি, খাট, আলনা, আয়রন সেফ, ড্রেসিং টেবিল সহ নানা আধুনিক সামগ্রী। তাড়িখানায় শ্রমিকদের গান গাওয়া, মালাকান্দী গ্রাম্য সঙ্গীত, ধাঙড় বস্তির কোরাস এবং হোটেল কাবেরীর রেকর্ড গান, গজল, কাওয়ালি প্রভৃতি তাদের নিজ নিজ সমাজের মানস-সংস্কৃতি'র (culture) পরিচায়ক। খাদ্যাভ্যাসের মধ্য দিয়ে সেই সমাজের সংস্কৃতির একটি দিক ধরা পড়ে। উপন্যাসে শহুরে কিছু খাদ্যের নাম উঠে এসেছে যেমন— টিকিয়া, চাটনি, কোর্মা, রেজালা, বিরিয়ানি, টার্কি রোস্ট, ইত্যাদি। আবার পানীয়ের মধ্যে — ডাচ বিয়ার, মায় স্কচ, বিলাতি বিয়ার, ফ্রেঞ্চ ওয়াইন, কফি ইত্যাদি। শওকত ওসমান তাঁর কাহিনি বুননের মধ্য দিয়ে এভাবেই তুলে ধরেছেন ঢাকার শহুরে সমাজ-সংস্কৃতির কিছু খণ্ড চিত্র।

ছয়

'লালসালু', 'সূর্য-দীঘল বাড়ী', 'চৌরসন্ধি' তিনটি উপন্যাসের গ্রন্থাকারে প্রকাশকাল যথাক্রমে — ১৯৪৮, ১৯৫৫ ও ১৯৬৮। তথা এই তিনটি গ্রন্থ অখণ্ড পাকিস্তানের তিন দশকের ফসল। কিন্তু রচনাকাল দেখতে গেলে 'লালসালু'র পুরো অংশ ও 'সূর্য-দীঘল বাড়ী'র কিছু অংশ স্বাধীনতা পূর্ববর্তীকালে রচিত। ১৯44 সালে আবু ইসহাক 'সূর্য-দীঘল বাড়ী' রচনা শুরু করেছিলেন, আর 'চৌরসন্ধি' পুরোপুরি ভাবে স্বাধীনতোত্তর কালপর্বের রচনা। তিনটি উপন্যাসেই মন্বন্তরের প্রসঙ্গ কিংবা প্রতিক্রিয়ার চিহ্ন স্পষ্ট। তবে 'লালসালু'-তে স্বাধীনতার কোনও প্রসঙ্গ নেই। যদিও 'সূর্য-দীঘল বাড়ী'র ষষ্ঠ পরিচ্ছেদে দাঙ্গা-দেশ ভাগের কথা প্রত্যক্ষভাবে এসেছে। আর 'চৌরসন্ধি'-তে ''তারপর আর ইংরেজ আমল রইল না।''[৬০] এই একটি সংক্ষিপ্ত বাক্যের মধ্য দিয়ে স্বাধীনতার সংবাদ উঠে আসতে দেখা যায়। ফলে 'সূর্য-দীঘল বাড়ী' ও 'চৌরসন্ধি' গ্রন্থদ্বয়ের মধ্যে কাহিনির কালগতভাবে দুটি পর্ব আছে— প্রাক্ স্বাধীনতার পর্ব ও স্বাধীনতোত্তর পর্ব। রচনার কালগত দিক ও রচনায় স্বাধীনতার প্রসঙ্গ ছাড়াও তিনটি উপন্যাস দুটি স্পষ্ট শ্রেণিতে বিভক্ত। যথা— গ্রামজীবনের প্রেক্ষাপটে রচিত উপন্যাস ('লালসালু', 'সূর্য-দীঘল বাড়ী') ও শহর জীবনাশ্রয়ী উপন্যাস ('চৌরসন্ধি')। প্রাক-স্বাধীনতা পর্বে মানুষের দুঃখ-দুর্দশার কথা, ধর্মকে আশ্রয় করে শাসন-শোষণের কথা বর্ণিত হয়েছে 'লালসালু'-তে। 'সূর্য-দীঘল বাড়ী'-তে আছে স্বপ্ন ও স্বপ্নভঙ্গের ঐতিহাসিক সত্য এবং প্রান্তিক মানুষের জীবন-বাস্তবতা। আর 'চৌরসন্ধি'-তে উঠে এসেছে পাকিস্তানের হাতে পূর্ববঙ্গের পুনর্বার পরাধীনতার প্রসঙ্গ। ফলে তিনটি উপন্যাসের মধ্যে কালগত ও বিষয়গত বৈচিত্র্য লক্ষ্য করা যায়। এখানে উল্লেখ্য যে, 'লালসালু' ও 'সূর্য-দীঘল বাড়ী'-র লক্ষ্য প্রান্তিক সমাজ ও সাধারণ নিম্নবিত্ত মানুষের জীবন-যাপন। কিন্তু 'চৌরসন্ধি'-র উদ্দেশ্য রূপকের ছলে রাজনৈতিক।

বেঁচে থাকার জন্য ঘর ছেড়ে বেরিয়ে পড়া, কোঁচ দিয়ে মাছ ধরা, চাষ করা, সমাজে ধর্মীয় অনুশাসন, ডাক্তারের তুলনায় পির, তাবিজ, জলপড়ার অধিক গুরুত্ব; কবরে মোমবাতি দান সহ বিভিন্ন বিশ্বাস, সংস্কার, আচার গ্রামের মানুষের শিক্ষাহীন কুসংস্কারাচ্ছন্ন মন, মিথ্যা গল্প বলে শিশুদের ভয় দেখানোর মতো বিবিধ বিষয়— 'লালসালু' ও 'সূর্য-দীঘল বাড়ী' উভয় উপন্যাসেই দেখা মেলে। 'লালসালু'-র মজিদ বা ব্যাপারী চরিত্র, 'সূর্য-দীঘল বাড়ী'-র জোবেদ আলী ফকির ও গদু প্রধান; 'চৌরসন্ধি'-র কাল্লু এবং কাপড় কলের মালিক -এদের প্রত্যেকের পেশা-পদ্ধতি ও সামাজিক অবস্থান আলাদা হলেও, লক্ষ্য তাদের এক; মানুষকে শোষণ করা। আর 'লালসালু' ও 'সূর্য-দীঘল বাড়ী'-তে নারীরা পুরুষের সহধর্মী ও সহকর্মী।

কিন্তু 'চৌরসন্ধি'-তে তার দেখা নেই। বরং 'চৌরসন্ধি'-র নারী অনেক বেশি ব্যষ্টি তথা ইন্ডিভিজুয়াল। তাই ''স্বামীর গোয়াল ঘর'' ভালো না লাগলে কুব্রার অন্য উপায় আছে; কিন্তু রহীমা, জমিলা, আমেনাদের তা নেই। জার্মান দার্শনিক Nietzsche বলেছিলেন-

> "If you desire peace of soul and happiness, belive. If you want to be a disciple of truth, search."[৬১]

এই নানাবিধ বিশ্বাস, সংস্কার, আচার -গ্রামের মানুষের 'অন্তর্গত রক্তের ভিতরে খেলা করে', এবং অপ্রাপ্তি ও অপপ্রাপ্তিকে ভুলে বেঁচে থাকার প্রণোদনা জোগায়।

'লালসালু' ও 'সূর্য-দীঘল বাড়ী'-র সাথে 'চৌরসন্ধি'-র জীবনযাপনে বিস্তর ব্যবধান বিদ্যমান। গ্রামের আসবাবহীন ঝুপড়ি, যাত্রা, কৃষিকাজ; ধান, গান, হুঁকো, পান্তাভাত কিংবা জাউ; কেরোসিনের প্রদীপ, নামাজের পাটি, পয়সা রাখার বাঁশের চোঙা; হাঁস, মুরগি প্রভৃতি পোষ্য; কোষা নৌকার সঙ্গে শহরের বিদেশি আসবাবপূর্ণ দালান; সিনেমা, সিগারেট, কল-কারখানা; বিরিয়ানি, টিকিয়া, রোস্ট; বৈদ্যুতিক বাতি, ম্যারেজ পার্টি, ট্যাক্সি, জীপ, তাড়ি, মদ প্রভৃতি উপকরণের পার্থক্য ও তজ্জনিত জীবনধারণের পার্থক্য পরিদৃশ্যমান হয়। ফলে উপন্যাসে শহুরে সংস্কৃতি (Urban culture) ও গ্রাম্য সংস্কৃতির (Rural culture) দ্বিবিধ পরিচয় সুস্পষ্ট। কিন্তু গ্রাম-শহরের মিশ্র সংস্কৃতি (Cross culture) উপন্যাসে সেই অর্থে নেই। উপন্যাসে গ্রামের নারীরা তো বটেই, পুরুষদেরও শিক্ষার ব্যবস্থা নেই। ফলে কাসুকে যখন ধান কাটা শেখানো হয়, হাসু যখন মুটেগিরি করে, মায়মুনের যে বয়সে বিয়ে হয় ও তারপর শ্বশুরবাড়ির লোক তাকে খেদিয়ে দেয়, সেই বয়সে ঢাকার চোর কাল্লুর মেয়ে সুরৎজন লেখা-পড়া করে। 'লালসালু' ও 'সূর্য-দীঘল বাড়ি'-তে বহুবিবাহ আছে, কিন্তু 'চৌরসন্ধি'-তে বহুবিবাহ নেই, আছে গণিকা গমন। গ্রামের পল্লি-প্রকৃতিতে গাছ একটি প্রধান উপকরণ। 'লালসালু'-র থোতামুখো তালগাছটি যেমন বাড়ির আনন্দ আর সুখের নিশানদার তেমনি, 'সূর্য-দীঘল বাড়ী'-র তালগাছ কুল-কৌলীন্য, মর্যাদা আর কালের নীরব সাক্ষী হয়ে থেকেছে। গ্রামকেন্দ্রীক উপন্যাসে চোর বা চুরির প্রসঙ্গ নেই, কারণ চুরি করার মতো কিছু তখন গ্রামে ছিলই না। পরিসংখ্যান থেকে জানা যায়, ১৯৫৯-৬০ সালে পূর্ববঙ্গের গ্রাম ও শহরে মাথাপিছু আয় ছিল যথাক্রমে ২৪৪ ও ৬২৫ টাকা। ১৯৬৯-৭০ সালে তা বেড়ে হয় ২৭৯ ও ৭৬২ টাকা। স্পষ্টতই গ্রামের তুলনায় শহরের মানুষের উপার্জন ছিল আড়াই গুনেরও বেশি। ফলে 'চৌরসন্ধি'-তে চোর ও চুরির প্রসঙ্গ স্বভাবতই একটা বড়ো জায়গা দখল করে আছে। তবে একটি বিষয়ে তিনটি উপন্যাসেই সাদৃশ্য আছে, আর তা হল— দারিদ্রতার সঙ্গে যুঝতে থাকা মানুষ। 'লালসালু'-তে দেখা যায় ''শস্যের চেয়ে টুপি বেশি'' আর 'চৌরসন্ধি'-তে ''মুসল্লীর চেয়ে ভিখিরী বেশি''। জিন্নাহ্'র হিন্দু-মুসলমান দ্বিজাতি তত্ত্বকে কেটে মুজিবুর রহমানের বাংলা-উর্দু দ্বিজাতি তত্ত্বের প্রতিষ্ঠা ঘটেছিল। কিন্তু এরই মধ্যে আর একটি দ্বিজাতি তত্ত্ব ক্রমশ নিঃশব্দে উঠে এসেছিল। আর তা হল— ধনী-দরিদ্র, হুজুর-মজুরের দ্বিজাতি তত্ত্ব। ফলে উপন্যাস তিনটিতে আর্থিক, আত্মিক; সামাজিক, সাংস্কৃতিক বিভক্তি ক্রমশ দূরপ্রসারী ও দুরপনেয় হয়ে সাহিত্যের পাতায় প্রতিবিম্বিত হয়েছে।

তথ্যসূত্র :

১. ঠাকুর, রবীন্দ্রনাথ, 'বাংলাভাষা-পরিচয়', কলিকাতা, বিশ্বভারতী গ্রন্থনবিভাগ, ১৯৩৮, পৃ. ৩৮
২. দাশ, জীবনানন্দ, 'জীবনানন্দ দাশের শ্রেষ্ঠ কবিতা' (দ্বিতীয় ভারবি সংস্করণ), কলকাতা, ভারবি, জানুয়ারি ১৯৮৪, পৃ. ১১১
৩. তদেব, পৃ. ১১২
৪. ওসমান, শওকত, 'প্রবন্ধসমগ্র', ঢাকা, সময় প্রকাশন, ফেব্রুয়ারি ২০১৪, পৃ. ৪৮৮
৫. হোসেন, সেলিনা, 'নীল ময়ূরের যৌবন' (প্রথম সংস্করণ), কলকাতা, নয়া উদ্যোগ, ২০০৯, পৃ. ১৪৪
৬. হাসিনা, শেখ, ''ভাইয়েরা আমার'', 'দেশ' ১৭ মার্চ ২০১৯, পৃ. ১৭
৭. আহমদ, নাসিরউদ্দীন, 'সভাপতির অভিভাষণ' (চতুর্থ বর্ষ), দ্র. মকসুদ, আবুল, সৈয়দ; ঘোষ, অনিল (সম্পাদিত) 'শ্রেষ্ঠ শিখা' (প্রথম সংস্করণ), কলকাতা, নয়া উদ্যোগ, ২০১০, পৃ. ৬১

৮. বন্দ্যোপাধ্যায়, অতীন, 'নীলকণ্ঠ পাখির খোঁজে' (অষ্টাদশ অখণ্ড সংস্করণ), কলকাতা, করুণা প্রকাশনী, জুন ২০১৯, পৃ. ১৯
৯. তদেব, পৃ. ৩০
১০. দাশ, শিশিরকুমার, (সংকলন ও সম্পাদনা), 'মাইকেল মধুসূদন দত্ত : নির্বাচিত রচনা', নতুন দিল্লি, সাহিত্য অকাদেমি, ১৯৯৫, পৃ. ১৩৯
১১. Gisbert, Pascual, J.S, 'Fundamentals of Sociology' (Third revised edition), Kolkata, Oriental Longman, 1973, P. 10
১২. Payne and Barbera Rae Jessica (Edited), 'A Dictionary of CULTURAL AND CRITICAL THEORY', West Sussex, UK, 2020, P. 168
১৩. Kroeber, Al. and Kluckhohn, Clyde, 'CULTURE A CRITICAL REVIEW OF CONCEPTS AND DEFINITIONS', Peabody Museum of American Archeology and Ethnology, Harvard University, 1952, P. 43
১৪. নীলিমা, নাজনীন, পৃথ্বিলা, (সম্পাদিত), 'আহমদ শরীফ রচনাবলী' (সপ্তম খণ্ড), ঢাকা, আগামী প্রকাশনী, ফেব্রুয়ারি ২০১৪, পৃ. ১২৮
১৫. আহমদ, মনসুর, আবুল, 'বাংলাদেশের কালচার' (প্রথম সংস্করণ), ঢাকা, আহমদ পাবলিশিং হাউস, অক্টোবর ১৯৬৬, পৃ. ১০
১৬. ঠাকুর, রবীন্দ্রনাথ, 'বাংলা শব্দতত্ত্ব' (তৃতীয় স্বতন্ত্র সংস্করণ), কলিকাতা, বিশ্বভারতী গ্রন্থনবিভাগ, বৈশাখ ১৩৯১, পৃ. ২০৬
১৭. চট্টোপাধ্যায়, সুনীতিকুমার, 'সাংস্কৃতিকী' (প্রথম সংস্করণ), কলিকাতা, বাক্-সাহিত্য, চৈত্র ১৩৬৭, পৃ. ৮
১৮. তদেব, পৃ. ৮
১৯. ওয়ালীউল্লাহ্, সৈয়দ, 'লালসালু' (প্রথম ভারতীয় সংস্করণ), কলকাতা, চিরায়ত প্রকাশন প্রাইভেট লিমিটেড, ফেব্রুয়ারি ২০১০, পৃ. ০৯
২০. তদেব, পৃ. ১০
২১. ঘোষ, শঙ্খ, (সংকলন ও সম্পাদন), 'সূর্যাবর্ত', কলিকাতা, বিশ্বভারতী গ্রন্থনবিভাগ, ৮ মে ১৯৮৯, পৃ. ২৮৭
২২. ওয়ালীউল্লাহ্, সৈয়দ, 'লালসালু' (প্রথম ভারতীয় সংস্করণ), কলকাতা, চিরায়ত প্রকাশন প্রাইভেট লিমিটেড, ফেব্রুয়ারি ২০১০, পৃ. ২২
২৩. তদেব, পৃ. ২৩
২৪. তদেব, পৃ. ৮৭
২৫. তদেব, পৃ. ৯৬
২৬. তদেব, পৃ. ৬১
২৭. তদেব, পৃ. ৫০
২৮. হুসেন, আবুল, ''বাঙালি মুসলমানের শিক্ষা সমস্যা'', দ্র. মকসুদ, আবুল, সৈয়দ; ঘোষ, অনিল (সম্পাদিত), 'শ্রেষ্ঠ শিখা' (প্রথম সংস্করণ), কলকাতা, নয়া উদ্যোগ, ২০১০, পৃ. ২৫৫
২৯. ওয়ালীউল্লাহ্, সৈয়দ, 'লালসালু' (প্রথম ভারতীয় সংস্করণ), কলকাতা, চিরায়ত প্রকাশন প্রাইভেট লিমিটেড, ফেব্রুয়ারি ২০১০, পৃ. ১৬
৩০. তদেব, পৃ. ২৮
৩১. তদেব, পৃ. ৩০
৩২. তদেব, পৃ. ৩২

৩৩. তদেব, পৃ. ৫৪
৩৪. ইসহাক, আবু, 'সূর্য-দীঘল বাড়ী' (প্রথম চিরায়ত সংস্করণ), কলকাতা, চিরায়ত প্রকাশন প্রাইভেট লিমিটেড, ডিসেম্বর ১৯৯২, পৃ. ২৪
৩৫. তদেব, পৃ. ১২১
৩৬. তদেব, পৃ. ১২১
৩৭. তদেব, পৃ. ১১৭
৩৮. ঘোষ, শঙ্খ, (সংকলন ও সম্পাদন), 'সূর্যাবর্ত', কলিকাতা, বিশ্বভারতী গ্রন্থনবিভাগ, ৮ মে ১৯৮৯, পৃ. ২৮৬
৩৯. ইসহাক, আবু, 'সূর্য-দীঘল বাড়ী' (প্রথম চিরায়ত সংস্করণ), কলকাতা, চিরায়ত প্রকাশন প্রাইভেট লিমিটেড, ডিসেম্বর ১৯৯২, পৃ. ২৬
৪০. তদেব, পৃ. ১০০
৪১. তদেব, পৃ. ২০
৪২. তদেব, পৃ. ১৬
৪৩. Sen, Amartya, 'Poverty and Famines', Oxford, Clarendon Press, 1981, P. 63
৪৪. দাশ, জীবনানন্দ, 'জীবনানন্দ দাশের শ্রেষ্ঠ কবিতা' (দ্বিতীয় ভারবি সংস্করণ), কলকাতা, ভারবি, জানুয়ারি ১৯৮৪, পৃ. ১৮
৪৫. ইসহাক, আবু, 'সূর্য-দীঘল বাড়ী' (প্রথম চিরায়ত সংস্করণ), কলকাতা, চিরায়ত প্রকাশন প্রাইভেট লিমিটেড, ডিসেম্বর ১৯৯২, পৃ. ৩১
৪৬. তদেব, পৃ. ৪৭
৪৭. আজাদ, হুমায়ুন, 'হুমায়ুন আজাদ সাক্ষাৎকার', ঢাকা, আগামী প্রকাশনী, ফেব্রুয়ারি ১৯৯৪, পৃ. ৭১
৪৮. তদেব, পৃ. ৬৩
৪৯. ওসমান, শওকত, 'শওকত ওসমান উপন্যাস সমগ্র ১', ঢাকা, সময় প্রকাশন, এপ্রিল ২০০০, পৃ. ৩৯৬
৫০. তদেব, পৃ. ৩৯৭
৫১. তদেব, পৃ. ৩৯৭
৫২. তদেব, পৃ. ৩৯৯
৫৩. তদেব, পৃ. ৪১৯
৫৪. তদেব, পৃ. ৩৯০
৫৫. তদেব, পৃ. ৩৯০
৫৬. তদেব, পৃ. ৪১৩
৫৭. তদেব, পৃ. ৪৩৬
৫৮. তদেব, পৃ. ৪৫৭
৫৯. তদেব, পৃ. ৪৫৮
৬০. তদেব, পৃ. ৪১২
৬১. ফজল, আবুল, ''তরুণ আন্দোলনের গতি'', দ্র. মকসুদ, আবুল, সৈয়দ; ঘোষ, অনিল (সম্পাদিত), 'শ্রেষ্ঠ শিখা' (প্রথম সংস্করণ), কলকাতা, ২০১০, পৃ. ২১৪